মৌল কথা

অশোককুমার ভট্টাচার্য

মৌল কথা

অশোককুমার ভট্টাচার্য

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা - ৭৯৯০০১

MAULA KATHA

by

Ashokkumar Bhattacharjya

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, 2011

প্রকাশক : দেবানন্দ দাম

জ্ঞান বিচিত্রা

11 জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা - 799001

প্রচ্ছদ : অপরেশ পাল

অক্ষর বিন্যাস : বিকাশ গণচৌধুরি

মুদ্রণ : এস ডি প্রিন্টার্স

32A পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা - 700 009

কলকাতা অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র

জ্ঞান বিচিত্রা

16 ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা - 700009

ফোন : (033) 2360 4981

সার্বিক যোগাযোগ

জ্ঞান বিচিত্রা কার্যালয়

11 জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা- 799001, ত্রিপুরা

ফোন : (0381) 232 3781 / 231 5121 / (033) 2360 4981

ISBN : 978-81-8266-257-5

আশি টাকা

কিছু কথা

জ্ঞান বিচিত্রায় ধারাবাহিক প্রকাশিত "মৌল কথা" পত্রিকার সম্পাদক স্নেহভাজন শ্রীদেবানন্দ দামের উদ্যোগে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে চলেছে।

"মৌল কথা"— মৌলদের জবানিতে ৯২টি প্রাকৃতিক মৌলের এবং বিজ্ঞানীদের দ্বারা সংশ্লেষিত বাকী মৌলদের জন্ম কাহিনি, নাম-ধাম, চিহ্ন, আচার-আচরণ, পর্যায়সারণীতে এদের অবস্থানের ক্রমবিকাশ, পর্যায়গত বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য, ইলেকট্রন বিন্যাস এবং এদের পারস্পরিক মিলন-বিরহ প্রভৃতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। মৌলদের বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং পর্যায় সারণির নতুন কলেবর ধারণের উল্লেখ করে, রসায়ন অনুরাগীদের ভাবনার জগতে খানিকটা সাড়া জাগানোর প্রত্যাশায়, 'অ-স-মা-প্ত' কবুল করে, সমাপ্ত হয়েছে "মৌল কথা"।

প্রত্যাশা পূরণ হলে মৌলরা কৃতার্থ হবে আর ভাষ্যকারের প্রয়াস সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

আন্তর্জাতিক রসায়নবিদ্যা বর্ষ

১অক্টোবর, ২০১১ — অশোককুমার ভট্টাচার্য

মৌল কথা

তরুণ বন্ধুরা, তোমরা আমাদের কথা শুনতে চাইছো ! আমাদের জন্মকথা, নাম-ধাম-গোত্র, আচার-আচরণ সম্পর্কে তোমাদের জানতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে জেনে আমাদেরও খুব ভাল লাগছে। কিন্তু আমাদের কথা আমরাই কি খুব ভাল জানি ? হয়তো অনেক কথাই তোমাদের না বলা রইলো। তোমরাও কি তোমাদের নিজেদের খুব ভাল জান !

আমরা মৌলিক পদার্থ, মূল পদার্থ বা মৌল (Element)। জল, বায়ু, মাটি, গাছ, লতাপাতা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ যা তোমরা তোমাদের চারপাশে দেখতে পাচ্ছো সবই আমাদের নিয়ে তৈরি হয়েছে। তোমাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার বিভিন্ন উপকরণ এমন কি তোমাদের মাঝেও আমরা বিরাজ করছি। বলতে পার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই আমরা বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছি, কখনও মুক্ত অবস্থায় আবার কখনও অন্যদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে।

পদার্থের তিন অবস্থা হলো কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। তোমরা জান কঠিন অবস্থা হচ্ছে পদার্থের সবচেয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ (most ordered) অবস্থা। পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন যে, কঠিন অবস্থায় পদার্থের আন্তরাণবিক আকর্ষণ হয় খুবই নিবিড় অর্থাৎ পদার্থের একটি অণু অন্য অণুকে নিবিড় আকর্ষণে কাছে টেনে রাখে। কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার এবং আয়তন দুই-ই আছে। তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন আছে কিন্তু নির্দিষ্ট আকার নাই। যে পাত্রে রাখা হয় তরল সে পাত্রেরই আকার ধারণ করে। বুঝতেই পাচ্ছো এমন আচরণ চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচায়ক নয়। তরলে আন্তরাণবিক আকর্ষণ অনেকটা শিথিল। গ্যাসের নির্দিষ্ট আয়তনও নেই, আকারও নেই। গ্যাস পাত্রের আকার ও আয়তন ধারণ করে। গ্যাসে আন্তরাণবিক আকর্ষণ প্রায় নগণ্য। তাই গ্যাস পদার্থের সবচেয়ে শৃঙ্খলাহীন (most disordered) অবস্থা। সবচেয়ে শৃঙ্খলাহীন অবস্থা বলা বোধ হয় ঠিক হল না, কারণ পদার্থের চতুর্থ অবস্থায় বিশৃঙ্খলার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায় আর পঞ্চম অবস্থায় বিশৃঙ্খলা চরম ও চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। এদের কথায় পরে আসা যাবে। সাধারণ তাপমাত্রায় আমরা কেউ কঠিন, কেউ তরল আবার কেউ বা গ্যাসীয়। আমরা কেউ ধাতু, কেউ বা অধাতু আবার কেউ বা ধাতুকল্প অর্থাৎ চরিত্রের দিক থেকে কতকটা ধাতব, কতকটা অধাতব, বলতে পার মধ্যপন্থী, কতকটা তোমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মতো।

তোমরা প্রশ্ন করবে মৌলিক পদার্থ বললেই তো সব বোঝা গেল না, মৌলিক পদার্থ কাদের বলা হয় ? হ্যাঁ, তোমাদের প্রশ্নটা খুবই সঙ্গত। এসো আমরা একবার পেছনের দিকে তাকাই—

দেখে নিই তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের কী নজরে দেখতেন ! শুনতে পাই আজকের দিনেও তোমাদের বিজ্ঞানীদের আমাদের নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। এমনটিই তো হবে কারণ আমাদের জানতে পারলেই তো তোমাদের নিজেদের জানা সহজ হবে।

তোমাদের সমাজে আমাদের প্রবেশ ঘটল বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে নয় ; বলতে পার দার্শনিকদের কল্পনায় ভর করেই আমরা তোমাদের সমাজে প্রবেশ করলাম। বিশ্ব চরাচরের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle, 384 - 322 খ্রিস্টপূর্ব) চার পদার্থের অস্তিত্বের কথা (Theory of four elements) বললেন। তাপ, শীতলতা, শুষ্কতা এবং আর্দ্রতা এই চারটি মৌলিক গুণ সম্পন্ন তাঁর প্রস্তাবিত চারটি মৌল হল — fire (আগুন), water (জল), air (বাতাস) এবং earth (মাটি)। তিনি আরও বললেন যে, এই চারটি পদার্থ বিভিন্ন অনুপাতে মিশে তৈরি করেছে দৃশ্য জগতের বিভিন্ন বস্তু। বহু শতাব্দী ধরে অ্যারিস্টটলের চার মৌল মতবাদ অপ্রতিদ্বন্দ্বী রইলো।
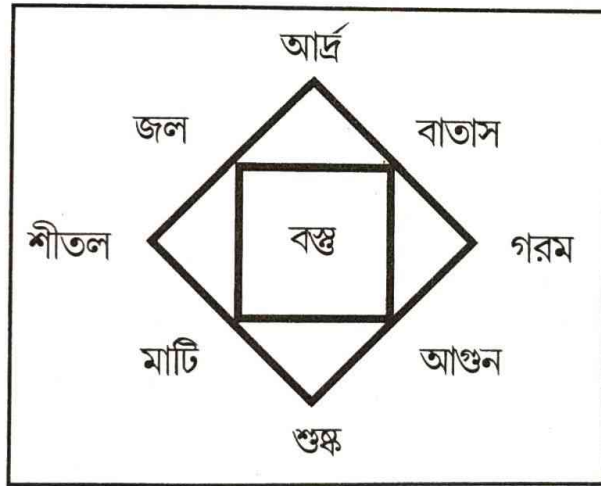
চিত্র ঃ 1 ঃ অ্যারিস্টটলের চার মৌল রূপ

অ্যারিস্টটলের বহু আগেই (600 - 500 খ্রিঃ পূর্ব) ভারতীয় দর্শনে ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজঃ (আগুন), মরুৎ (বাতাস) এবং ব্যোম (মহাশূন্য) এই পঞ্চভূতের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। এই পঞ্চভূতের সমন্বয়ে বস্তু তৈরির উল্লেখ তোমরা সাংখ্য দর্শনে পাবে।

এলো অ্যালকেমি যুগ। অ্যালকেমিস্টদের সহজলভ্য ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করবার এক অদ্ভুত খেয়াল জাগল। তাঁরা খুঁজলেন 'পরশপাথর' (Philosopher's stone) যার পরশে অন্যান্য ধাতু স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়। এক অলৌকিক গুপ্তবিদ্যা হিসেবে অ্যালকেমি বিদ্যার চর্চা শুরু হয় মিশরে। দ্বাদশ শতাব্দীতে মিশর থেকে স্পেনের মধ্য দিয়ে তা ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অষ্টম শতাব্দীতে ভারতে তান্ত্রিক মতে স্বাধীনভাবে অ্যালকেমি বিদ্যার

অনুশীলন হতো। অ্যালকেমিস্টরা পরশপাথরের সন্ধান পান নি কিন্তু আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি এবং বিসমাথ এই তিনটি মৌলের পৃথকীকরণে সমর্থ হয়েছিলেন। আর অ্যালকেমি যুগেই রসায়ন শাস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত ঘটে বলা যায়। তোমরা কি জান বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী নিউটনও অ্যালকেমি বিদ্যার অনুশীলন করতেন।

নাম-গোত্র, আচার-আচরণের সম্যক ধারণা তৈরি না হলেও গোল্ড, সিলভার, মারকারি, আয়রণ, টিন, লেড, কপার প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার তোমাদের সমাজে বহুদিন ধরে চলে আসছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে অ্যালকেমিস্টরা ভারতীয় ও গ্রিক গ্রহাচার্যদের দেওয়া গ্রহ-নক্ষত্রের চিত্র অনুকরণ করে বিভিন্ন পদার্থকে চিহ্নিত করেন। তাঁরা এক-একটি ধাতুকে কোনো না কোনো প্রাচীন পৌরাণিক দেবতাকে উৎসর্গ করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অ্যালকেমি যুগ প্রসার লাভ করেছিল।

চিত্র 2 ঃ অ্যালকেমি যুগে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদার্থের চিহ্ন
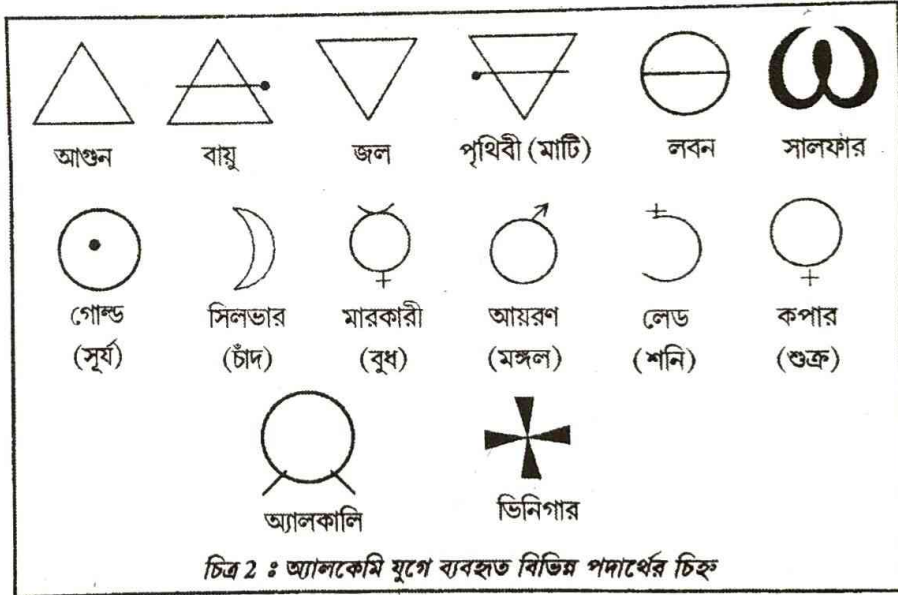
ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে এলেন আয়ট্রো কেমিস্টরা (Iatrochemists)। তাঁরা খুঁজলেন মানুষের অনন্ত যৌবন লাভের উপায়, আর তার জন্য তৈরি করতে চাইলেন 'চিরজীবন সুধা' (Elixir of life)। প্যারাসেলসাস (Para celsus 1493-1541) অ্যালকেমিস্টদের ঠুকে বললেন যে রসায়নের উদ্দেশ্য সুস্বাস্থ্যের জন্য ওষুধ তৈরি করা — সোনা, রূপা তৈরি করা নয়। তিনি আরও বললেন যে, সব সজীব বস্তুতে লবণ, মারকারি ও সালফার বিভিন্ন অনুপাতে বর্তমান। এরা যথাক্রমে কাঠিন্য, উদ্বায়িতা এবং দাহ্যতা গুণের বাহক। দেহে এদের কারো ঘাটতি ঘটলে শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয় এবং ঐ বিশেষ মৌলটি প্রয়োগে উপসর্গ দূর হয়।

বলা যায়, প্রকৃত বিজ্ঞান হিসেবে রসায়নবিদ্যার যাত্রা শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। আমরাও দার্শনিকের কল্পনার জগৎ পেরিয়ে বিজ্ঞানের আলোকে যেন এক নব জন্মের দিশা পেলাম।

রসায়নবিদ্ রবার্ট বয়েল (Robert Boyle 1627-1691) অ্যারিস্টটলের চার মৌল মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে বললেন যে আগুন, জল, বাতাস এবং মাটিকে মৌল হিসেবে গণ্য করা চলে না কারণ এদের সমন্বয়ে অন্য কোনো পদার্থ প্রস্তুত করা যায় না।। তিনি তাঁর বই 'দ্য স্কেপ্টিক্যাল কেমিস্ট' (The Sceptical Chemist)-এর মাধ্যমে জানালেন যে, মৌল একটি সরল, অদ্বিতীয়, অমিশ্র পদার্থ যার রাসায়নিক বিভাজন হয় না। অ্যালকেমিস্টদের মৌল ভাবনাকেও তিনি বললেন— অচল। রসায়ন বিজ্ঞানীরা আমাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার স্বার্থেই অথবা আমরা তাঁদেরই খুঁজে পাওয়া ধন বিবেচনায় আমাদের 'রাসায়নিক' বিশেষণে ভূষিত করতে চাইলেন। অর্থাৎ আমরা মৌল উপাধির উপর রাসায়নিক মৌল (Chemical Element) খেতাবে পরিচিত হতে চললাম।

আমাদের বোধ হয় তোমরা এখন খানিকটা চিনতে পারছ। তোমরা দুটি লোহার পাত নাও। একটি পাতকে কয়েক টুকরোতে কেটে ফেল আর অর্ধেকটি টুকরো হামান দিস্তাতে গুঁড়ো কর। এবার পরীক্ষা করলে তোমরা দেখতে পাবে যে পাত, পাতের টুকরো বা পাতের গুঁড়োতে লোহা ছাড়া আর কোনো মৌলের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই লোহা একটি মৌল বা রাসায়নিক মৌল। তবে রাসায়নিক মৌল কী আর তার মৌলিকত্বের দাবিদার কে তা বুঝতে হলে তোমাদের সামনের পথে আরও এগোতে হবে।

রসায়ন বিজ্ঞানের জনক বলে খ্যাত ল্যাভয়সিয়েরও (Antoine Laurent Lavoisier, 1743 - 1794) বললেন যে, মৌল সরল পদার্থ যা রাসায়নিক উপায়ে বিভাজিত করা যায় না। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন যে বায়ুতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন বর্তমান। ল্যাভয়সিয়ের রসায়নের বিভিন্ন দিগন্ত খুলে দিলেও মৌল ভাবনাকে সংশয়মুক্ত স্তরে পৌঁছে দিতে পারলেন না। তোমরা হয়তো জান ল্যাভয়সিয়েরের পিতা ছিলেন ফরাসী দেশের একজন ধনবান আইনজীবী। তিনি নিজেও আইনে স্নাতক উপাধি অর্জন করেন কিন্তু রসায়নে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং সারাজীবন রসায়ন চর্চায় নিয়োগ করেন আর ফলস্বরূপ রসায়নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। গভীর পরিতাপের বিষয় যে, ল্যাভয়সিয়ের ফরাসী বিপ্লবের শিকার হন এবং গিলোটিনে তাঁর শিরচ্ছেদ করা হয়। বিজ্ঞানী লাপ্লাস (Laplace) আক্ষেপ করে বলেছিলেন ঃ "ল্যাভয়সিয়েরের শিরচ্ছেদ ঘটাতে এক মিনিট সময়ও লাগেনি কিন্তু এমন একটি শির তৈরি হতে হাজার হাজার বছর লাগবে।"

ডালটনের পরমাণু তত্ত্বের প্রকাশ রসায়নের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ সম্পর্কে ভারতীয় দার্শনিক কণাদের পরমাণু তত্ত্ব এবং পরবর্তী সময়ে গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটস ও লিউকিপসের (Democritos & Leukippos, 560 - 470

খ্রিস্টপূর্ব) অনুরূপ ধারণায় অনুপ্রেরিত হয়ে জন ডালটন (John Dalton, 1766 - 1844) 1803 সালে তাঁর পরমাণু তত্ত্ব প্রকাশ করেন। মৌলের ক্ষুদ্রতম অংশকে 'সরল পরমাণু' (Simple atom) এবং যৌগের ক্ষুদ্রতম অংশকে 'যৌগ পরমাণু' (Compound atom)' আখ্যা দিয়ে তিনি বললেন যে, কোনো বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে পরমাণু। পরমাণু অবিভাজ্য। একে ধ্বংস করা যায় না, সৃষ্টি করা যায় না। পরমাণুই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। কোনো একটি মৌলের পরমাণু সর্বতোভাবে অভিন্ন। রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন মৌলের পরমাণু সরল অনুপাতে পাশাপাশি সহাবস্থান করে যৌগ গঠন করে। ডালটন তত্ত্বে মৌল ভাবনায় কিছু কিছু সংযোজন ঘটলেও মৌলের মৌলিকত্বের চাবিকাঠির হদিশ মেলে নি।

চিত্র - 3 ঃ ডালটন প্রদত্ত মৌল ও যৌগের চিহ্ন
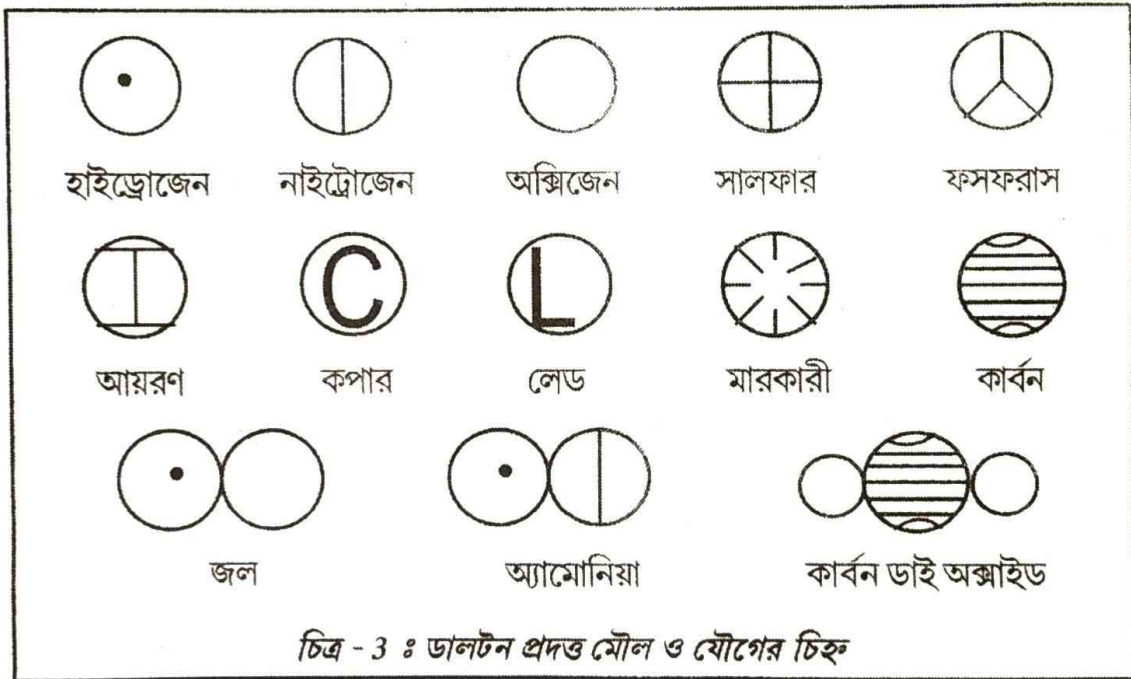
রাসায়নিক মৌল ধারণা স্পষ্ট করতে হলে মৌল উপাদান অর্থাৎ পরমাণুর খবরও ভাল করে নিতে হবে। ডালটনের পরমাণু মতবাদের অসংগতি ধরা পড়ল। জানা গেল যে, পরমাণু নিরেট অবিভাজ্য নয়। পরমাণুতে একাধিক আদিকণার উপস্থিতি প্রমাণিত হল। স্যার জে জে থমসন (Sir J. J. Thomson) 1897 সালে পরমাণুতে অপরাধর্মী নগণ্য ভর-সম্পন্ন একটি কণিকার উপস্থিতির কথা জানালেন, পরবর্তী সময়ে যার নাম দেওয়া হয়েছিল ইলেকট্রন। পর পর পরমাণুতে আরও আদি কণার অস্তিত্ব ধরা পড়ল। পরমাণুতে ইলেকট্রনের তুলনায় প্রায় 1837 গুণ ভারী পরাধর্মী একটি কণার উপস্থিতি প্রমাণিত হলো। রাদারফোর্ড (Rutherford, 1929)-এর নাম দিলেন প্রোটন। প্রোটনের ভর প্রায় একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের সমান। স্যাডউইক (Chadwick) পরমাণুতে প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর-সম্পন্ন একটি নিস্তড়িৎ কণার উপস্থিতির ঘোষণা দিলেন 1932 খ্রিস্টাব্দে, যার নাম দেওয়া হলো

নিউট্রন। পরমাণুতে অস্থায়ী পজিট্রন, নিউট্রিনো, অ্যান্টিনিউট্রিনো, ম্যাসন প্রভৃতি কণিকার কথাও বলা হলো। আজকাল কণা পদার্থবিদরা প্রোটন, নিউট্রনকেও আদিকণা হিসেবে গণ্য করেন না। তাঁরা মনে করেন, "Flavour," "Colour", "Strangeness" এবং "Charm"-এর প্রকার ভেদে বিভিন্ন জাতীয় কুয়ার্কই (Quark) হবে পদার্থের মৌল উপাদান। ধারণাটা আমাদের কাছে স্বচ্ছ নয় ; এইটুকু বোঝা গেল যে, আদিরও আদি আছে আর তার সন্ধান চলতেই থাকবে। গড়া হলো পরমাণুর নক্‌শা। বলা হলো, পরাধর্মী প্রোটন ও নিস্তড়িৎ নিউট্রন নিয়ে গঠিত পরমাণু-কেন্দ্রকে কেন্দ্রীণ (Nucleus), ঘিরে বিভিন্ন স্তরে বিরাজ করে অপরাধর্মী ইলেকট্রন। কেন্দ্রীণে অখণ্ড ধনাত্মক আধান থাকে যাকে কেন্দ্রীণ আধান (Nuclear charge) বলা হয় এবং ল্যাটিন অক্ষর Z দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। কেন্দ্রীণে অবস্থিত পরাধর্মী প্রোটন সংখ্যাই কেন্দ্রীণ আধান সূচিত করে আর কেন্দ্রীণ আধান (Z) অর্থাৎ কেন্দ্রীণে অবস্থিত প্রোটন সংখ্যা মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা নির্দেশ করে। এবার আমাদের কথাটা তোমাদের আরেকটু স্পষ্ট করে জানাতে পারি, কেন্দ্রীণ আধানই আমাদের মৌলিকত্বের দাবিদার। অর্থাৎ কেন্দ্রীণে অভিন্ন আধান (Z)) বিশিষ্ট পরমাণুগুচ্ছ নিয়েই আমরা এক-একটি রাসায়নিক মৌল যেমন অক্সিজেন মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 8 অর্থাৎ 8 কেন্দ্রীণ আধান বিশিষ্ট বা কেন্দ্রীণে 8 প্রোটন সংখ্যা বিশিষ্ট, পরমাণুগুচ্ছ নিয়েই অক্সিজেন মৌল। পরমাণুর কেন্দ্রীণে পরাধর্মী প্রোটন ছাড়াও থাকে আধান-নিরপেক্ষ নিউট্রন (ব্যতিক্রম হাইড্রোজেন)। কেন্দ্রীণে অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনের মোট ভর একটি পরমাণুর ভর নির্দেশ করে, কারণ ইলেকট্রনের ভর খুবই নগণ্য। কোনো মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রীণে প্রোটন সংখ্যা অভিন্ন হলেও নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে। অভিন্ন প্রোটন-সংখ্যা এবং ভিন্ন নিউট্রন সংখ্যা-বিশিষ্ট পরমাণুগুলিকে বলা হয় সমস্থানিক (Isotope)। গ্রিক শব্দ 'isos' মানে 'সম' এবং 'topos' মানে 'স্থান' থেকে সমস্থানিক শব্দটা এসেছে। অক্সিজেন মৌলের তিনটি সমস্থানিক আছে। বস্তুত প্রকৃতিতে বিরাজিত আমরা তিন-চতুর্থাংশ মৌলই সমস্থানিক বিশিষ্ট।

প্রসঙ্গক্রমে বলছি যে, আমরা রাসায়নিক মৌলরা সামগ্রিক ভাবে নিস্তড়িৎ অর্থাৎ আমাদের পরমাণুর কেন্দ্রীণে অবস্থিত পরাধর্মী প্রোটনসংখ্যা এবং কেন্দ্রীণকে ঘিরে অবস্থিত অপরাধর্মী ইলেকট্রন সংখ্যা সমান। আর আমাদের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসই আমাদের রাসায়নিক ধর্ম নির্ধারিত করে।

আমাদের ধর্ম-কর্মের কথা তোমাদের পরে শোনাব। আগে আমাদের নাম-গোত্রের কথা জানিয়ে দিই। আমরা ধরণীর বুকে একে অন্যের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে যৌগরূপে বিরাজ করছি ; তোমাদের রসায়নবিজ্ঞানীরাও প্রতিনিয়ত নূতন নূতন যৌগ তৈরি করে চলেছেন। তোমরা কি জান বর্তমানে যৌগ সংখ্যা কত ? যৌগসংখ্যা এককোটি ছাড়িয়ে গেছে এবং প্রতি বছর যোগ

সারণি - 1ঃ কয়েকটি মৌলের সমস্থানিক

মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা	পারমাণবিক ওজন	ভর সংখ্যা	প্রোটন + নিউট্রন	প্রাচুর্য শতাংশ
হাইড্রোজেন	1	1·008	1	1 + 0	99·9844
			2	1 + 1	0·0156
			3	1 + 2	~ 0
অক্সিজেন	8	16·0044	16	8 + 8	99.76
			17	8 + 9	0·04
			18	8 + 10	0.20
নাইট্রোজেন	7	14·008	14	7 + 7	99·62
			15	7 + 8	0.38
ক্লোরিণ	17	35·457	35	17 + 18	75·4
			37	17 + 20	24·6
আর্গন	18	39·944	36	18 + 18	0.307
			38	18 + 20	0.060
			40	18 + 22	99.633

হচ্ছে নূতন প্রায় পঞ্চাশ হাজার সংশ্লেষিত যৌগ। কাজটি দুরূহ সন্দেহ নেই তবুও যৌগগুলি বিশ্লেষণ করলে তোমরা দেখতে পাবে সবগুলি যৌগে বর্তমান ভিন্ন ভিন্ন মৌলের মোটসংখ্যা দাঁড়াবে একশতের মতো। অর্থাৎ আমাদের প্রায় একশত মৌল নিয়েই এতসব যৌগ তৈরি হয়েছে, হচ্ছে। আমরা বিরানব্বইটি (92) মৌল প্রকৃতির কোলেই জন্ম নিয়েছি— বাকিগুলি বিজ্ঞানিগণ পরীক্ষাগারে জন্ম দিয়েছেন, দিয়ে চলেছেন।

আমরা যারা প্রকৃতিতে বিরাজ করছি— তোমাদের বিজ্ঞানিগণ প্রকৃতির কোল থেকেই তাদের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ছিনিয়ে নিয়েছেন, ছিনিয়ে নেবার গল্পও তোমাদের কিছু কিছু শোনাব। তোমরা বলবে— আবিষ্কার করেছেন। ছিনিয়ে নিয়েছেন, কুড়িয়ে পেয়েছেন, আবিষ্কার করেছেন— যাই বলো, তাই বলো কিন্তু তোমাদের বিজ্ঞানিগণ তো আমাদের জন্মদাতা নন ! আমাদের জন্মদাতা তাহলে কে ? কীভাবে আমাদের জন্ম হলো ?

শুনতে পাই সৃষ্টিরহস্য উন্মোচনে তোমাদের বিজ্ঞানীরাও খুব তৎপর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কখন, কীভাবে সৃষ্টি হলো, পৃথিবীর জন্ম কখন, কীভাবে হল, পৃথিবীতে কখন, কীভাবে প্রাণের উন্মেষ ঘটল আর মানুষের আগমনই কখন, কীভাবে হলো— এই প্রশ্নগুলির শেষ উত্তর গবেষকরা খুঁজছেন; আর শেষের মাঝে অশেষের হাতছানি যেন গবেষকদের আচ্ছন্ন করে তুলেছে, তাড়া করছে।

তোমাদের কি মনে হয় না যে, আমাদের জন্ম-প্রক্রিয়া, ক্রিয়াকলাপ এবং পৃথিবীর বুকে প্রাণের উন্মেষ ঘটা আর বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে, উত্তরণের পথ ধরে মানুষের আগমনের মধ্যে কোথাও একটা যোগসূত্র আছে ! তোমাদের কি মনে পড়ে ছেলেবেলার পুতুল গড়া ভাঙা খেলার কথা! মনে না ধরা পর্যন্ত চলত তোমাদের ভাঙা-গড়া খেলা ! আমাদের মনে হয় সব সৃষ্টির পেছনেই চলে আসছে এক গড়া-ভাঙার প্রক্রিয়া। শুধু গড়লেই তো চলবে না। গড়ন মনোমত হওয়া চাই— টেকসই হওয়া চাই। আমাদের জন্মের আড়ালেও হয়তো গড়া-ভাঙার খেলা কাজ করেছিল।

চতুর্থ অবস্থায় পদার্থের পরমাণুর ঘরের ইলেকট্রন (ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট) দলে দলে বা একযোগে ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট কেন্দ্রীণের শাসন অমান্য করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীরা পদার্থের এ অবস্থাকে বলছেন প্লাজমা অবস্থা। কয়েক হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপেই একটি পদার্থ প্লাজমা রূপ ধারণ করতে পারে। প্লাজমা অবস্থাকেই একসময় পদার্থের শেষ অবস্থা মনে করা হতো। কিন্তু তাত্ত্বিক পন্ডিতেরা জানালেন যে, পঞ্চম অবস্থাই হবে পদার্থের শেষ অবস্থা যে অবস্থায় পরমাণুর ইলেকট্রন গোষ্ঠি, প্রোটন গোষ্ঠি এবং নিউট্রন গোষ্ঠি বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করবে। এ অবস্থাটা তোমাদের বিজ্ঞানীদের মানসচক্ষেই বিরাজ করছে কারণ পরমাণুর কেন্দ্রীণের শিথিল বাঁধনে বাঁধা ইলেকট্রন গোষ্ঠিকে বিচ্ছিন্ন করতে প্রয়োজন হয় কয়েক হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপের। আর কেন্দ্রীণের মধ্যে নিবিড় বাঁধনে বাঁধা প্রোটনও নিউট্রনকে বিচ্ছিন্ন করতে দরকার কয়েক হাজার কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার। এত উচ্চ তাপে কিন্তু আমাদের এ ধরিত্রী মাতা বাষ্প হয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। তোমরা হয়তো প্রশ্ন করবে "পদার্থের মহাশূন্যে বিলীন হওয়ার অর্থ কি হারিয়ে যাওয়া ?" তোমাদের কবি নজরুল ইসলাম তো বলেছেন — " তোমার মহাবিশ্বে প্রভু হারায় না তো কিছু।" আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি বলেছেন —

"যে ফুল না ফুটিতে ঝড়েছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা"

অর্থাৎ কবি সাহিত্যিকেরা বলছেন যে প্রকৃতিতে কিছুই হারিয়ে যায় না। বিজ্ঞানও তো সেই

কথাই বলে। কোনো বস্তু সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংস করা যায় না। সৃষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে হারায় না কিছুই — শুধু পদার্থের রূপান্তর ঘটে, পারস্পরিক রূপান্তর ঘটে শক্তি বস্তুর। তোমাদের শাস্ত্রকারেরা কি এ অবস্থাকেই 'নিরাকার পরমব্রহ্ম' বলতে চাইছেন ! আর প্রাকৃতিকপ্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কি নিরাকার ব্রহ্ম সাকার আকৃতি ধারণ করতে পারে ? প্রকৃতিতে কি সাকার-নিরাকার রূপান্তর চক্রাকারে নিরন্তর ঘটে চলেছে ? অনুরূপ ভাবনা সম্ভবত বিজ্ঞানীদেরও প্রভাবিত করেছিল। বিজ্ঞানী জর্জ লেমেটো ও তাঁর সতীর্থরা জানালেন যে, সৃষ্টির আদিতে পঞ্চম অবস্থায় বিরাজিত পদার্থই এক অতিকায় বিস্ফোরণের (Big Bang) ফলে ছড়িয়ে ছিট্‌কে পড়ে এবং কালক্রমে বিচ্ছিন্ন অংশ থেকে সৃষ্টি হয় নক্ষত্রজগৎ— সূর্যের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে পৃথিবী— পৃথিবীর গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে চাঁদ। এমনটি হবেই তো। পঞ্চম অবস্থার চরম অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা তো চিরকাল চলতে পারে না আর তত্ত্বটা পরখ করে দেখার জন্য প্রখ্যাত পদার্থবিদ্ লিন ইভানসের (Lyn Evans) তত্ত্বাবধানে অতি সম্প্রতি (10 ই সেপ্টেম্বর, 2008) সর্বকালের বৃহৎ এক বিতর্কিত মহাপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পরীক্ষালব্ধ ফল নূতন তথ্য যোগাবে আশা করা যায়। মহাপরীক্ষায় হয়তো এমন একটি অদৃশ্য অজানা অচেনা কণার সন্ধান মিলবে যা সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনে সহায়ক হবে— এমনটিই মনে করেন একদল বিজ্ঞানী। তাঁরা কণাটির নাম দিয়েছেন 'God Particle' অর্থাৎ 'ঈশ্বরের কণা'। অধ্যাপক পিটার হিগস্ (Peter Higgs) অবশ্য 1964 সালেই এমন একটি কণার অস্তিত্বের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যার নাম দেওয়া হয়েছিল ''Higgs Boson।'' বিজ্ঞানীরা সফল হলে আমাদের জন্মরহস্যও উদঘাটিত হবে আশা করি। আমাদের মাঝে মাঝে মনে হয় তোমাদের ছেলেবেলার পুতুল ভাঙা-গড়া খেলার মতোই মহাশক্তিধারিণী প্রকৃতিও হয়তো পৃথিবীর জন্মলগ্নে এবং পরবর্তী সময়ে খেলাচ্ছলে পঞ্চম অবস্থায় বিচ্ছিন্ন ভাবে বিরাজিত প্রোটন গোষ্ঠি, নিউট্রন গোষ্ঠি ও ইলেকট্রন গোষ্ঠি থেকে বিভিন্ন সংখ্যায় এদের মিশিয়ে আমাদের পরমাণুর পুতুল গড়ছিলেন আর ভাঙছিলেন। টেকসই হবার সুবাদে আমরা অনেকেই স্থায়িত্ব পেলাম এবং কালক্রমে ধরিত্রীর বুকে, গর্ভে, বহিরাবরণে মৌল অথবা যৌগ অবস্থায় স্থান করে নিলাম। এ অবশ্যই তোমাদের পাঁচ-দশ বছরের ছেলেবেলার ব্যাপার নয়। শুনতে পাই বর্তমান সমাজ তোমাদের এতটুকু শৈশবও কেড়ে নিয়েছে। খেলাধূলার সুযোগ তোমরা বড় একটা পাও না বা তোমাদের দেওয়া হয় না। কিন্তু প্রকৃতির হাতে অঢেল সময়। মহাকালের আয়ুর বরাত পেয়ে যুগ যুগ ধরে আমাদের পরমাণুর পুতুল গড়া-ভাঙার খেলা চালাতে তার কোনো অসুবিধা ছিল না। তাছাড়া গড়া পুতুল টেকসই না হলে প্রকৃতির মনে ধরবে কেন ? যারা মনোমত হল না, টেকসই হল না তারা ভেঙে পড়ল, হারিয়ে গেল। প্রকৃতিতে আমাদের সঙ্গে নেই এমন মৌলের পরমাণু গড়ার কাজে বিজ্ঞানীরাও তো এগিয়ে এসেছেন এবং কিছু

কিছু মৌল গড়েছেন। আমাদের আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীদের নূতন মৌল গড়ার কথায় আমরা পরে আসছি।

তোমরা জান, ধ্বনি প্রকাশক চিহ্নই বর্ণ। একটি ভাষা ভালো করে জানা, বুঝা, লেখাপড়ার জন্য যেমন বর্ণমালার প্রয়োজন তেমনি রাসায়নিক মৌলকে চেনা-জানার জন্য, মৌলের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ প্রকাশের জন্য রাসায়নিক বর্ণমালার (Chemical alphabet) প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন রসায়নবিদ্‌রা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত মৌলের নামকরণ ও চিহ্নিতকরণের নিয়মমাফিক কোনো পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি। ব্যারণ জনস্ জ্যাকব বার্জেলিয়াস (Baron Jons Jakob Berzelius) 1814 সালে রাসায়নিক বর্ণমালা প্রণয়নের অর্থাৎ আমাদের রাসায়নিক চিহ্নের (Chemical symbol) মাধ্যমে চিহ্নিত করার নিয়মনীতির প্রস্তাব রাখলেন। তিনি বললেন যে,

- আমাদের নামের আদ্যক্ষর আমাদের রাসায়নিক চিহ্ন নির্দেশ করবে। যেমন অক্সিজেন (Oxygen) মৌলের চিহ্ন O।

- আমাদের ল্যাটিন নামের ব্যবহার যদিও উঠে যাচ্ছে তবুও যাদের ল্যাটিন নাম আছে তাদের রাসায়নিক চিহ্ন ল্যাটিন নাম থেকেই নেওয়া হবে। যেমন সোডিয়াম মৌলের ল্যাটিন নাম ন্যাট্রিয়াম (Natrium) এবং রাসায়নিক চিহ্ন Na।

- যদি দুই বা ততোধিক মৌলের নামের আদ্যক্ষর এক হয় তাহলে নামের পরবর্তী স্বাতন্ত্র্যসূচক অক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে মৌলের রাসায়নিক চিহ্ন দেওয়া হয়। যেমন হাইড্রোজেন (Hydrogen) ও হিলিয়াম (Helium) মৌল দুটির নামের আদ্যক্ষর 'H'। তাই হাইড্রোজেন মৌলকে H রাসায়নিক চিহ্ন এবং হিলিয়াম মৌলকে He রাসায়নিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে তোমাদের বলে রাখি আমাদের চিহ্নের মহিমা কেবলমাত্র আদ্যক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমেই শেষ হয়ে যায় না। আমাদের চিহ্ন একটি পরমাণু নির্দেশ করে এবং পারমাণবিক ওজনের ধারণা প্রকাশ করে। যেমন— কার্বনের (Carbon) রাসায়নিক চিহ্ন C। C এক পরমাণু কার্বন এবং 12 ভাগ ওজনের কার্বন নির্দেশ করে। চিহ্নের সাহায্যে কোনো বস্তুর এক অণুর প্রকাশ বস্তুটির সংকেত বা আণবিক সংকেত (Formula বা Molecular formula) বোঝায়। যেমন— হাইড্রোজেন মৌলের সংকেত H_2 ; বোঝা গেল, একটি হাইড্রোজেন অণু দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু নিয়ে গঠিত। আবার জল একটি যৌগ, এর সংকেত H_2O। H_2O এক অণু জল নির্দেশ করে। জল পান করে তোমরা কি বলতে পার যে, H_2O পান করেছ ? না, তা যথার্থ হবে না কারণ তোমরা তো মেপে এক অণু জলই পান করনি।

আমাদের নাম-ধাম প্রকাশের আগে Element (মৌল) নামটা কীভাবে এল বলে নিই। বলা হয়, Element (মৌল) শব্দটি ল্যাটিন বর্ণমালা L, m, n এবং t থেকে উদ্ভূত ; বর্ণমালাগুলি উচ্চারিত হয় যথাক্রমে ‘el’, 'em’, ‘en’, ‘te’ অর্থাৎ বর্ণমালার সমবায়ে গঠিত ল্যাটিন শব্দটি হলো ‘elementum’, আর তার থেকেই ‘element’ (মৌল) শব্দটি এসেছে। বর্ণমালা সমন্বয়ে যেমন করে অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয় তেমনি চিহ্নের দ্বারা প্রকাশিত বিভিন্ন মৌলের, যাদের রাসায়নিক বর্ণমালা হিসেবে গণ্য করা হয়, সমবায়ে গঠিত হয় বিভিন্ন যৌগ। আর সম্ভবত এ ভাবনাই বিজ্ঞানীদের Element নামটি গ্রহণে প্রভাবিত করেছিল।

আমাদের রূপ, রং, উৎস, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি আমাদের নামকরণে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। আমাদের নামকরণ করা হয়েছিল পৌরাণিক দেব-দেবীর নামে, গ্রহ-নক্ষত্রের নামে, রাজার নামে, দেশের নামে, নদীর নামে, বিজ্ঞানীদের নামে। আমাদের নাম দেওয়া হয়েছিল রূপ, রং, উৎস এবং বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। তোমাদের মনে হতে পারে যে, আমাদের জন্মকথা— আবিষ্কারের কথা ভালো করে জানানোর আগেই নাম-ধাম, এ যে ‘রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ— রামনাম’ ! হলই বা, আমাদের বুঝতে যদি তাতে সুবিধা হয় ক্ষতি কী ?

আমাদের নামকরণে তোমরা যথেষ্ট বৈচিত্র্যের পরিচয় পাবে। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রাচীনকাল থেকেই সোনা (Gold), রুপা (Silver) , তামা (Copper), লোহা (Iron), টিন (Tin), সিসা (Lead) এবং পারদ (Mercury) এই সাতটি ধাতব মৌলের ব্যবহার জানতেন। বস্তুত এরা তোমাদের সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে অংশ নিয়েছিল। এদের নামকরণের ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। শুনতে পাই তোমাদের সমাজেও অনেক সময় কানা ছেলের নাম দেওয়া হয় ‘পদ্মলোচন’; দুরন্ত ছেলেকে ডাকা হয় ‘সুবোধ’, ‘সুশীল’ নাম ধরে। সেই দিক থেকে আমাদের নামধাম অধিকতর অর্থ বহন করে বলতে পারি।

সম্ভবত অরোরা (Aurora) অর্থাৎ সোনার ঔজ্জ্বল্য থেকেই এর ল্যাটিন নাম হয়েছে “অর‍্যাম” (Aurum) আর Aurum থেকেই সোনার রাসায়নিক চিহ্ন দাঁড়িয়েছে Au।

রুপার ল্যাটিন নাম “আরজেন্টাম” (Argentum) কথাটার অর্থ হল ‘আলোর মতো সাদা’। রূপার রাসায়নিক চিহ্ন Ag।

তামার ল্যাটিন নাম “কিউপ্রাম” (Cuprum), চিহ্ন Cu।

লোহার রাসায়নিক চিহ্ন Fe তার ল্যাটিন নাম “ফেরাম” (Ferrum) থেকে এসেছে।

টিনের ল্যাটিন নাম “স্ট্যানাম” (stannum)। ল্যাটিন নাম থেকেই টিনের রাসায়নিক চিহ্ন হয়েছে Sn।

সীসার ল্যাটিন নাম "প্লাম্বাম" (Plumbum), চিহ্ন Pb।

অ্যারিস্টোট্‌ল পারদের নাম দিয়েছিলেন "তরল রুপা" এবং ভাইয়ো স্কো রাইডস বলেছিলেন "রুপার জল"। পারদের ল্যাটিন নাম "হাইড্রারজিরাম" (Hydrargyrum) কথাটা এসেছে 'Hydros' মানে জল আর "argyros" মানে রুপা অর্থাৎ রুপার জল — মানে দেখতে রুপার মতো আর অবস্থার নিরিখে তরল। এর রাসায়নিক চিহ্ন Hg।

আমাদের কারো কারো নামকরণ হয়েছে দেবদেবীর নামে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেবতা "থোর" (Thor)-এর নামে 90 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম হয়েছে থোরিয়াম (Thorium), এর রাসায়নিক চিহ্ন Th।

সুন্দর বর্ণ বিশিষ্ট যৌগের জননী হবার সুবাদে 23 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম সৌন্দর্যের দেবী 'Vanadia'-র নামে হয়েছে ভ্যানাডিয়াম (Vanadium), রাসায়নিক চিহ্ন V।

মৌলের নাম টাইটানিয়াম (Titanium) হয়েছে গ্রিক পুরাণের 'Titan' -এর নামে, এর রাসায়নিক চিহ্ন Ti, পারমাণবিক সংখ্যা 22।

গ্রিক পুরাণের 'Prometheus' -এর নামে 61 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম হয়েছে প্রোমেথিয়াম (Promethium), রাসায়নিক চিহ্ন Pm।

73 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম হয়েছে ট্যানটালাম (Tantalum) গ্রিক পুরাণের রাজা ট্যানটালাস্ (Tantalus)-এর নামে। এর রাসায়নিক চিহ্ন Ta। সুইডিশ Itterbul গ্রামের সাদা অক্সাইড খনিজ থেকে মৌলটির নিষ্কাশন ছিল খুবই সমস্যাসংকুল। তাই সুইডিশ রসায়নবিদ A. Ekberg Tantalus-এর যন্ত্রণার কথা মনে করে মৌলটির নাম দেন Tantalum।

রাজা ট্যানটালাসের কন্যা নায়োবির (Niobe) নামে 41 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম হয়েছে নায়োবিয়াম (Niobium), রাসায়নিক চিহ্ন Nb।

গ্রহ নক্ষত্রের নামেও আমাদের কারো কারো নামকরণ হয়েছে। ল্যাটিন টেলুরিস (Telluris) মানে পৃথিবী আর পৃথিবীর ল্যাটিন নাম থেকেই 52 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম হয়েছে টেলুরিয়াম (Tellurium), রাসায়নিক চিহ্ন Te।

মৌলের নামকরণে তোমাদের বিজ্ঞানীদের সূর্যের কথা ঠিকই মনে ছিল। 2 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলকেই তাঁরা নাম দিলেন হিলিয়াম (Helium) সূর্যের নামে। গ্রিক হিলিয়স্ (Helios) মানে সূর্য। হিলিয়ামের রাসায়নিক চিহ্ন He।

চন্দ্রের নামে 34 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম হয়েছে সেলেনিয়াম (Selenium), গ্রিক সেলেনে (Selene) মানে চন্দ্র। এর রাসায়নিক চিহ্ন Se।

গ্রহাণু সেরেস (Ceres)-এর নামে 58 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম হয়েছে সেরিয়াম (Cerium), রাসায়নিক চিহ্ন Ce।

প্যালাডিয়াম (Palladium) নাম হয়েছে খুদে গ্রহ প্যালাস (Pallus)-এর নামে। এর পারমাণবিক সংখ্যা 46, রাসায়নিক চিহ্ন Pd।

প্রকৃতিতে পাওয়া সর্বশেষ মৌলটির নাম দেওয়া হয়েছে ইউরেনিয়াম (Uranium) গ্রহ ইউরেনাস (Uranus)-এর নামে। ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা 92, চিহ্ন U ।

বিজ্ঞানীদের নামের সংগেও আমাদের কারো কারো নাম জুড়ে গেছে।

রাশিয়ার বিজ্ঞানী সমরস্কির নামে 62 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম হয়েছে সামারিয়াম (Samarium), রাসায়নিক চিহ্ন Sm।

64 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম ফিনল্যান্ডের বিজ্ঞানী গ্যাডোলিনের নামে দেওয়া হয়েছে গ্যাডোলিনিয়াম (Gadolinium)। এর রাসায়নিক চিহ্ন Gd।

দেশের নামেও মৌলের নামকরণ হয়েছে যেমন জার্মানির (Germany) নামে 32 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম হয়েছে জার্মেনিয়াম (Germanium), রাসায়নিক চিহ্ন Ge।

ইউরোপ (Europe) থেকে মৌলের নাম হয়েছে ইউরোপিয়াম (Europium)। এর পারমাণবিক সংখ্যা 63, চিহ্ন Eu।

রাশিয়ার ল্যাটিন নাম রুথেনিয়া (Ruthenia) আর তার থেকে 44 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম হয়েছে রুথেনিয়াম (Ruthenium), রাসায়নিক চিহ্ন Ru।

পোল্যান্ডের (Poland) নামে মৌলের নাম হয়েছে পোলোনিয়াম (Polonium) ; এর রাসায়নিক চিহ্ন Po, পারমাণবিক সংখ্যা 84।

87 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম ফ্রান্সের (France) নামে হয়েছে ফ্রান্সিয়াম (Francium), রাসায়নিক চিহ্ন Fr।

মৌলের নামকরণে শহরের এমনকী গ্রামের নামও জুড়ে আছে। শহরের ল্যাটিন নামে মৌলের

নামকরণ হয়েছে, যেমন প্যারিসের ল্যাটিন নাম লুটেসিয়া (Lutecia) থেকে 71 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম হয়েছে লুটেসিয়াম (Lutecium), রাসায়নিক চিহ্ন Lu। কিঞ্চিৎ ঘষামাজা করে সম্প্রতি এর বানান দাঁড়িয়েছে Lutetium-এ। কপেনহ্যাগেন শহরের অন্য নাম হ্যাফনিয়া থেকে মৌলের নাম হয়েছে হ্যাফনিয়াম (Hafnium), এর পারমাণবিক সংখ্যা 72, রাসায়নিক চিহ্ন Hf। স্টক্‌হল্‌ম শহরের নাম থেকে 67 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম হয়েছে হোলমিয়াম (Holmium), রাসায়নিক চিহ্ন Ho।

স্ক্যানডিনাভিয়া শহরের নামে মৌলের নামকরণ হয়েছে স্ক্যানডিয়াম (Scandium), এর পারমাণবিক সংখ্যা 21, রাসায়নিক চিহ্ন Sc।

স্ক্যানডিনাভিয়ার আরেক নাম থুল থেকে 69 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম হয়েছে থুলিয়াম (Thulium), রাসায়নিক চিহ্ন Tm।

স্কটল্যান্ডের একটি গ্রাম স্ট্রন্‌সিয়ার নামে একটি মৌলের নাম হয়েছে স্ট্রন্‌সিয়াম, এর পারমাণবিক সংখ্যা 38, রাসায়নিক চিহ্ন Sr।

সুইডেনের একটি গ্রাম ইটারবিতে (Ytterby) প্রাপ্ত খনিজ পদার্থে চারটি মৌলের সন্ধান পাওয়া যায়। ইটারবির নামে চারটি মৌলের নামকরণ হয় —

ইট্রিয়াম (Yttrium) পারমাণবিক সংখ্যা 39, চিহ্ন Y।

ইটারবিয়াম (Ytterbium) পারমাণবিক সংখ্যা 70, চিহ্ন Yb।

টারবিয়াম (Terbium) পারমাণবিক সংখ্যা 65, চিহ্ন Tb।

এরবিয়াম (Erbium) পারমাণবিক সংখ্যা 68, চিহ্ন Er।

জার্মানীর রাইন নদীর নামে 75 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম হয়েছে রেনিয়াম (Rhenium), রাসায়নিক চিহ্ন Re।

আমাদের কারো কারো নামকরণে আমাদের বর্ণ, গন্ধ, গুণাবলীরও তোমরা পরিচয় পাবে।

হরিদ্রাভ সবুজ হবার সুবাদে মৌলের নাম হয়েছে ক্লোরিন (Chlorine), গ্রিক Chloros মানে হরিদ্রাভ সবুজ। এর পারমাণবিক সংখ্যা 17, রাসায়নিক চিহ্ন Cl।

গ্রিক Iodos মানে বেগুনি আর তার থেকেই 53 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম হয়েছে আয়োডিন (Iodine) কারণ আয়োডিনের বর্ণ বেগুনি, রাসায়নিক চিহ্ন I।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে মৌলের রঙের বাহার দেখে 77 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম দেওয়া হয়েছে ইরিডিয়াম (Iridium), গ্রিক Iris মানে রামধনু। ইরিডিয়ামের রাসায়নিক চিহ্ন Ir।

গ্রিক Chroma মানে রং। রং বিশিষ্ট যৌগ গঠনের সুবাদে মৌলের নাম দেওয়া হয়েছে ক্রোমিয়াম (Chromium)। এর পারমাণবিক সংখ্যা 24, রাসায়নিক চিহ্ন Cr।

যৌগের জলীয় দ্রবণ গোলাপি। তাই মৌলের নাম হয়েছে রোডিয়াম (Rhodium, গ্রিক Rhodon মানে গোলাপি। রোডিয়ামের রাসায়নিক চিহ্ন Rh, পারমাণবিক সংখ্যা 45।

গ্রিক Bromos মানে বদ্‌গন্ধ। আর তার থেকেই 35 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট বদ্‌গন্ধ-ধারী মৌলের নাম হয়েছে ব্রোমিন (Bromine), রাসায়নিক চিহ্ন Br।

ঝাঁঝালো গন্ধের সুবাদে মৌলের নাম হয়েছে অসমিয়াম (Osmium), গ্রিক Osme মানে গন্ধ। অসমিয়ামের রাসায়নিক চিহ্ন (Os), পারমাণবিক সংখ্যা 76।

নামকরণে মৌলের বর্ণালির প্রতিফলনও লক্ষ্য করবে তোমরা।

55 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের আসমানি বর্ণালি অনুসারে নাম হয়েছে সিজিয়াম (Cesium), ল্যাটিন Caesius মানে আসমানি, এর রাসায়নিক চিহ্ন Cs।

মৌলের লাল বর্ণালির জন্য নাম দেওয়া হয়েছে রুবিডিয়াম Rubidium), ল্যাটিন Rubidus মানে লাল। রুবিডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা 37, রাসায়নিক চিহ্ন Rb।

গ্রিক Thallos মানে সবুজ প্রবাহ। সবুজ প্রবাহ সদৃশ বর্ণালির জন্য মৌলের নাম হয়েছে থ্যালিয়াম (Thallium)। এর পারমাণবিক সংখ্যা 81, রাসায়নিক চিহ্ন Tl।

নীল বর্ণালি বিশিষ্ট মৌলের নাম ইন্ডিয়াম (Indium)। দেশমাতার নামে একটি মৌলের নামকরণে তোমরা আনন্দিত বুঝতে পারি। তবে যে পটভূমিকায় এ নামকরণ হয়েছে তা হয়তো তোমাদের এক বিভীষিকাময় সময়ের কথা মনে করিয়ে দেবে। Indigo মানে নীল; ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 'নীল' চাষ হত আর সেই সুবাদে মৌলটির নাম দেওয়া হয়েছিল ইন্ডিয়াম। এর পারমাণবিক সংখ্যা 49, রাসায়নিক চিহ্ন In। নীল চাষের প্রসঙ্গ এলে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর অমানবিক আচরণের কথা মনে করে তোমরা বোধহয় এখনও আঁত্‌কে ওঠ।

অক্সিজেন (Oxygen) নামকরণ হয়েছিল গ্রিক Oxys মানে 'অম্ল' এবং Geinomai মানে 'আমি প্রস্তুত করি'। তখনকার দিনে মনে করা হত সব অম্লেই অক্সিজেন বর্তমান।

যদিও ধারণাটি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত তবুও নামকরণ অপরিবর্তিতই আছে। অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা 8, রাসায়নিক চিহ্ন O।

অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে জল তৈরি করার সুবাদে মৌলটির নাম হয়েছে হাইড্রোজেন (Hydrogen), গ্রিক Hydro মানে জল। আমাদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য, সবচেয়ে হালকা মৌল হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা 1, রাসায়নিক চিহ্ন H।

নাইটার (Nitre, KNO_3) সৃষ্টিকারক হিসেবে মৌলটির নামকরণ হয়েছিল নাইট্রোজেন (Nitrogen)। এর পারমাণবিক সংখ্যা 7, রাসায়নিক চিহ্ন N। গ্রিক Arsenicos মানে 'সক্রিয়' আর তার থেকেই মৌলের নাম হয়েছে আর্সেনিক (Arsenic)। এর পারমাণবিক সংখ্যা 33, রাসায়নিক চিহ্ন As।

নিষ্ক্রিয় হওয়ার সুবাদে মৌলটির নাম আর্গন (Argon), গ্রিক Argos মানে নিষ্ক্রিয়। আর্গনের পারমাণবিক সংখ্যা 18, রাসায়নিক চিহ্ন Ar।

আলো বিকিরণ করে তাই মৌলটির নাম দেওয়া হয়েছে ফসফরাস (Phosphorous), গ্রিক Phos মানে 'আলোক', Phoros মানে 'বহনকারী'। ফসফরাসের পারমাণবিক সংখ্যা 15, রাসায়নিক চিহ্ন P।

ছটা বিচ্ছুরণের সুবাদে একটি তেজস্ক্রিয় মৌলের নাম হয়েছে রেডিয়াম (Radium), ল্যাটিন Radus মানে ছটা। এর পারমাণবিক সংখ্যা 88, রাসায়নিক চিহ্ন Ra।

89 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের নাম হয়েছে অ্যাকটিনিয়াম (Actinium), গ্রিক Aktis মানে ছটা। এর রাসায়নিক চিহ্ন Ac।

স্থিতিশীলতায় ঘাটতির জন্য মৌলটির নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাস্টাটিন (Astatin) গ্রিক Astatos মানে 'অস্থায়ী'। এর পারমাণবিক সংখ্যা 85, রাসায়নিক চিহ্ন At।

91 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলটি একটি আলফা কণিকার (পরা তড়িৎবাহী হিলিয়াম আয়ন, ${}^{4}_{2}He^{+2}$) বিচ্ছুরণে অ্যাকটিনিয়াম মৌলে পরিণত হয়। তাই ঐ মৌলটির নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটোঅ্যাকটিনিয়াম (Proto- actinium), বা প্রোট্যাক্টিনিয়াম (Protactinium), গ্রিক Protos মানে প্রথম। এর রাসায়নিক চিহ্ন Pa।

57 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলটির সঙ্গে আরও চৌদ্দটি মৌল ($Ce^{58}Lu^{71}$) অন্তরীণ থাকে তাই মৌলটির নাম দেওয়া হয়েছে ল্যান্থানাম (Lanthanum)। গ্রিক Lanthanos মানে 'অন্তরীণ থাকা। অন্তরীণ চৌদ্দটি মৌলকে বলা হয় ল্যান্থানাইড সারি। ল্যান্থানামের রাসায়নিক চিহ্ন La।

খুব কষ্টের বিনিময়ে সন্ধান মিলেছিল বলে 66 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলটির নাম দেওয়া হয়েছিল ডিসপ্রোসিয়াম (Dysprosium), গ্রিক Dis-prositos মানে কষ্টে পাওয়া। এর রাসায়নিক চিহ্ন Dy।

মৌলটির আবিষ্কার একটি নূতন মৌল নির্দেশ করছিল তাই নাম দেওয়া হয়েছিল নিয়ন (Neon), গ্রিক Neos মানে 'নূতন'। এর পারমাণবিক সংখ্যা 10, রাসায়নিক চিহ্ন Ne।

লুকানো অবস্থায় মৌলটির সন্ধান মিলেছিল বলে নাম দেওয়া হয়েছিল ক্রিপ্টন (Krypton), গ্রিক Kryptos মানে 'লুকানো'। এর পারমাণবিক সংখ্যা 36, রাসায়নিক চিহ্ন Kr।

অজানা-অচেনা হওয়ার জন্য মৌলটির নাম দেওয়া হয়েছিল জেনন (Xenon), গ্রিক Xenos মানে 'অচেনা' — এর পারমাণবিক সংখ্যা 54, রাসায়নিক চিহ্ন Xe।

43 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলটি প্রাকৃতিক মৌল হিসেবে গণ্য হলেও বিজ্ঞানিগণ তার প্রথম সন্ধান পেয়েছিলেন কৃত্রিম পথ ধরে তাই এর নাম দেওয়া হয়েছিল টেকনেশিয়াম (Technetium), গ্রিক Technetos মানে 'কৃত্রিম', এর রাসায়নিক চিহ্ন Tc।

যৌগিক উৎসের নামানুসারেও মৌলের নামকরণ করা হয়েছে যেমন ঃ 'Soda' থেকে সোডিয়াম (Sodium)। সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা 11, রাসায়নিক চিহ্ন Na এসেছে তার ল্যাটিন নাম Natriun থেকে। 'Potash' থেকে পটাশিয়াম (Potassium)। এর ল্যাটিন নাম Kalium, পারমাণবিক সংখ্যা 19, রাসায়নিক চিহ্ন K । ল্যাটিন শব্দ 'Calx', মানে 'চুন' থেকে নাম হয়েছে ক্যালসিয়াম (Calcium)। এর পারমাণবিক সংখ্যা 20, রাসায়নিক চিহ্ন Ca। 'Baryta' থেকে বেরিয়াম (Barium)। এর পারমাণবিক সংখ্যা 56, রাসায়নিক চিহ্ন Ba। 'Borax' থেকে বোরন (Boron), এর পারমাণবিক সংখ্যা 5, রাসায়নিক চিহ্ন B। 'Lithia' থেকে লিথিয়াম (Lithium)। এর পারমাণবিক সংখ্যা 3, রাসায়নিক চিহ্ন Li। সিলিকন (Silicon) নাম হয়েছে 'Silica' থেকে। সিলিকনের পারমাণবিক সংখ্যা 14, রাসায়নিক চিহ্ন Si। 'Alumina' থেকে অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)। এর পারমাণবিক সংখ্যা 13, রাসায়নিক চিহ্ন Al। ফিকে সবুজ পাথর 'Beryl' থেকে বেরিলিয়াম (Beryllium)। এর পারমাণবিক সংখ্যা 4, রাসায়নিক চিহ্ন Be। 'Fluorspar' থেকে নাম হয়েছে ফ্লোরিন (Fluorine)। এর পারমাণবিক সংখ্যা 9, রাসায়নিক চিহ্ন F। মূল্যবান লাল পাথর 'Zircone' থেকে জার্কোনিয়াম (Zirconium)। এর পারমাণবিক সংখ্যা 40, রাসায়নিক চিহ্ন Zr।

74 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলটির নাম দেওয়া হয়েছে টাংস্টেন (Tungsten), সুইডিশ

Tung মানে 'ভারী', sten মানে 'পাথর'। উলফ্রেমাইট (Wolframite) খনিজ উৎসের ভিত্তিতে এর নাম হয়েছিল উলফ্রাম (Wolfram) এবং রাসায়নিক চিহ্ন W।

প্রকৃতিতে বিরাজিত আমাদের সদস্য অনেকের নাম ও রাসায়নিক চিহ্নের কথা তোমাদের বলা হয়েছে। প্রসঙ্গ এলে অন্য সদস্যদের নামও তোমাদের জানাব। তোমরা হয়তো প্রশ্ন করবে যে আমাদের বংশবৃদ্ধির প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া 92 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌল ইউরেনিয়ামে গিয়ে থেমে গেল কেন! সত্যি, আমাদের মনেও একই জিজ্ঞাসা। অমিত শক্তিধারিণী প্রকৃতি আমাদের বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া অন্তত 100 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌল পর্যন্ত টানতে পারলেন না কেন! আবার 90 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌল পর্যন্ত জন্ম দিয়েও তো প্রকৃতি থেমে যেতে পারতেন!

আগে বলেছিলাম যে তোমাদের ছেলেবেলার পুতুল খেলার মতো প্রকৃতিও হয়তো আমাদের 'পুতুল গড়া-ভাঙা-জুড়ে দেবার খেলা' যুগ যুগ ধরে চালিয়েছিলেন যতক্ষণ না 'গড়া পুতুলগুলি' মনমতো হয়েছিল, টেকসই হয়েছিল। এমনও তো হতে পারে যে প্রকৃতি 92 পারমাণবিক সংখ্যার অধিক পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট মৌলের 'পুতুল'ও গড়েছিলেন কিন্তু তা যথেষ্ট টেকসই না হওয়ায় অর্থাৎ ওদের আয়ুর জোর কম থাকায় তোমাদের বিজ্ঞানীরা আর ওদের সন্ধান পান নি! অথবা এমনও তো হতে পারে যে প্রকৃতিতে প্রাচুর্যের ঘাটতির কারণে ঐরকম মৌলগুলি বিজ্ঞানীদের চোখকে ফাঁকি দিয়েছে — দিচ্ছে। আমাদের জন্মের সঠিক দিনক্ষণ বলতে না পারলেও বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে জন্মলগ্নে এবং জন্মের প্রাক্ ও উত্তর লগ্নে পৃথিবী ছিল খুবই উত্তপ্ত আর ঐ অবস্থায়ই প্রকৃতির কোলে মৌলের তাপ-কেন্দ্রকীয় সংশ্লেষণ (Thermonuclear Synthesis) ঘটে। এর ক্রিয়াকৌশল সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা দ্বিধামুক্ত নন। প্রকৃতিতে ইউরেনিয়ামোত্তর (Transuranium) মৌলের সন্ধান না পেলেও বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান প্রক্রিয়া থেমে থাকে নি। জার্মান বিজ্ঞানী আর স্যুইনে (R. Swinne) 1925 সালে বলেন যে পার্থিব বস্তুতেই ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলের সন্ধান পাওয়া যাবে আর এ ব্যাপারে তিনি বাজি ধরতেও প্রস্তুত ছিলেন। তেজস্ক্রিয় মৌলের 'অর্ধজীবনের' পার্থক্যের তত্ত্বীয় গবেষণা থেকে বিজ্ঞানী স্যুইনে সিদ্ধান্তে আসেন যে ইউরেনিয়ামের ঠিক পরের মৌলগুলির 'অর্ধজীবন' কম হলেও 98 থেকে 102 এবং এবং 108 থেকে 110 সংখ্যার মধ্যবর্তী মৌলগুলির 'অর্ধজীবন' যথেষ্ট দীর্ঘ হবে। মেরু প্রদেশ থেকে সংগৃহীত এবং স্টক্‌হল্‌ম যাদুঘরে রক্ষিত কালো রঙের অনিয়তাকার পদার্থে ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলের সন্ধানে তিনি মহাজগৎ থেকে প্রাপ্ত এবং গ্রিনল্যান্ড থেকে প্রাপ্ত ধূলিকণা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয় নি, ফলে তাঁর ভাবনা বিস্মৃতিতে তলিয়ে যায়।

তোমরা জান অ্যালকেমিস্টদের সহজলভ্য ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন সফল হয়নি, 'পরশপাথরের' সন্ধান তাঁরা পান নি কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন উত্তরসূরিদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল বলা যায়। কেন্দ্রকীয় রূপান্তর (Nuclear transmutation) বিক্রিয়ার মাধ্যমে মৌলের রূপান্তর ঘটানো আজ সম্ভব হয়েছে। তত্ত্বগতভাবে মাটি থেকে এখন তোমাদের সোনা পেতে আর কোনো বাধা নেই। মৌলের তেজস্ক্রিয়তা এবং প্রকৃতিতে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পথ ধরে ভারী মৌলের অধিকতর স্থিতিশীল হালকা মৌলে রূপান্তরের ঘটনা বিজ্ঞানীদের ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলের জন্মদানে অনুপ্রেরিত করেছিল।

ভারী তেজস্ক্রিয় মৌলের কেন্দ্রকের অপেক্ষাকৃত হালকা মৌলের কেন্দ্রকে ভেঙে পড়ার ঘটনাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিলেন কেন্দ্রকীয় বিভাজন (Nuclear Fission)। আর এ ব্যাপারে 'নিউট্রনগুলি' বর্ষণ পরমাণু কেন্দ্রকের হৃদয় বিদীর্ণ করার এক মোক্ষম হাতিয়ার। অতি বেগবান আলফা কণা বা অন্যান্য আয়নও আঘাতকারী কণা হিসেবে লক্ষ্য মৌলের কেন্দ্রকে আঘাত হানতে পারে। আবার অতি উচ্চ তাপে দুটি কেন্দ্রকের জুড়ে যাবার ঘটনাকে বিজ্ঞানীরা বলছেন কেন্দ্রকীয় সংযোজন (Nuclear Fusion)। প্রাকৃতিক অনুরূপ ঘটনাবলী অধ্যয়ন করে বিজ্ঞানিগণও এ বিদ্যা প্রয়োগে প্রয়াসী হন।

বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে কম পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলগুলির পরমাণু কেন্দ্রক অপেক্ষাকৃত বেশি স্থিতিশীল। এদের কেন্দ্রকে প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা প্রায় সমান-সমান — যেমন ঃ $_{6}C^{12}$, সংখ্যা 6 কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা, (Z) অর্থাৎ কার্বন পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটন সংখ্যা এবং সংখ্যা 12 কার্বনের ভর সংখ্যা (A) অর্থাৎ কেন্দ্রকে প্রোটন সংখ্যা (Z) + নিউট্রন সংখ্যা (N) নির্দেশ করে। তেমনি $_{7}N^{14}$, $_{8}O^{16}$, $_{10}Ne^{20}$, $_{11}Na^{23}$, $_{20}Ca^{40}$ ইত্যাদি। ক্যালসিয়াম মৌলের পর থেকেই মৌল পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটন সংখ্যার তুলনায় নিউট্রন সংখ্যা বাড়তে থাকে অর্থাৎ নিউট্রন ঃ প্রোটন অনুপাত (n : p ratio) বাড়তে থাকে এবং নিউট্রন ঃ প্রোটন অনুপাত 1.5-এর বেশি হলে কেন্দ্রকের স্থিতিশীলতায় ঘাটতির প্রবণতা প্রকাশ পায়। কোনো মৌল পরমাণুর কেন্দ্রকে অবস্থিত নিউট্রন ও প্রোটন সংখ্যার অনুপাত 1.6 -এর কাছাকাছি হলে কেন্দ্রকটি অস্থায়ী হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলফা কণা, বিটা কণা এবং গামা রশ্মি বিকিরণ করে সুস্থিত কেন্দ্রকে পরিণত হতে প্রয়াসী হয়। এ ঘটনাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity) এবং মৌলগুলিকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় মৌল (Radioactive Elements)। তোমরা হয়তো জান তেজস্ক্রিয় বিকিরণ জীবদেহে দূরারোগ্য ক্ষত সৃষ্টি করে। এক নজরে তেজস্ক্রিয় রশ্মিসমূহের বৈশিষ্ট্য দেখে নেওয়া যেতে পারে (সারণি - 2)।

সারণি - 2 ঃ তেজস্ক্রিয় রশ্মিসমূহের বৈশিষ্ট্য

	আলফা (α) - রশ্মি	বিটা (β) - রশ্মি	গামা (γ) - রশ্মি
প্রকৃতি	নির্দিষ্ট ভর বিশিষ্ট পরা তড়িৎবাহী হিলিয়াম আয়নের সমষ্টি, ${}^{4}_{2}He^{+2}$	প্রায় ভরহীন অপরা তড়িৎবাহী ইলেকট্রন কণার সমষ্টি	অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ, তড়িৎ নিরপেক্ষ
ভর	4.0015 a.m.u., প্রতিটি α কণার ভর প্রোটনের ভরের 4 গুণ	0.000548a.m.u., প্রতিটি β কণার ভর ইলেকট্রনের ভরের সমান	ভরবিহীন
তড়িৎ পরিমাণ	পরাতড়িৎ পরিমাণ দুই একক (+2) বা 9.6×10^{-10} e.s.u.	অপরা তড়িৎ পরিমাণ এক একক (–1) বা 4.8×10^{-10} e.s.u.	নিস্তড়িৎ
ভেদন ক্ষমতা	সবচেয়ে কম, 0.1mm পুরু অ্যালুমিনিয়াম পাত গতিরোধ করে।	α রশ্মি থেকে বেশি, 5mm পুরু অ্যালুমিনিয়াম পাত গতি রোধ করে।	সবচেয়ে বেশি। 750mm পুরু সিসার পাত গতি রোধ করতে সক্ষম নয়
গতিবেগ	আলোর প্রায় একদশমাংশ	আলোর গতিবেগের $\frac{1}{10}$ থেকে $\frac{9}{10}$ ভাগ	প্রায় আলোর গতিবেগের সমান
জীবকোষের উপর ক্রিয়া	জীবকোষের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে, জীব-দেহে ক্ষত সৃষ্টি করে।	α রশ্মির তুলনায় কম ক্ষতিকারক।	জীবদেহে গভীর দুরারোগ্য ক্ষতের সৃষ্টি করে।

তেজস্ক্রিয় মৌলের আয়ু তার অর্ধআয়ুষ্কাল (Half life) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যে সময়ে কোনো তেজস্ক্রিয় মৌলের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্ধেকে পরিণত হয় সেই সময় কালকে ঐ মৌলের অর্ধ আয়ুষ্কাল বলে। একটি মৌলের কোনো নির্দিষ্ট তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের অর্ধ আয়ুষ্কালের মান নির্দিষ্ট। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের অর্ধ আয়ুষ্কাল ভিন্ন।

অধিক অর্ধআয়ুষ্কাল সম্পন্ন তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি তুলনামূলকভাবে অনেকটা নিরাপদ কারণ এরা কম তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটায়। ফলে এরা বাণিজ্যিক ব্যবহারে প্রশস্ত।

যে সকল তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধআয়ুষ্কাল 500 বছরের বেশি তারা গভীর স্বাস্থ্যহানির কারণ

ঘটায় না — তাই তারাও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী।

যে সকল তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধআয়ুষ্কাল মাত্র কয়েকদিন তারা খুব বিপজ্জনক এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী নয়।

আর কয়েক মিনিটের অর্ধ আয়ুষ্কাল সম্পন্ন তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি মারাত্মক স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটায় তাই গবেষণার গণ্ডির মধ্যেই এদের আবদ্ধ রাখা হয়।

সারণি - 3 তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের অর্ধআয়ুষ্কাল

মৌল	সমস্থানিক	বিকিরণ	অর্ধআয়ুষ্কাল
ইউরেনিয়াম	${}_{92}U^{238}$	α, γ	4.5×10^{9} বছর
ইউরেনিয়াম	${}_{92}U^{234}$	α, γ	2.48×10^{5} বছর
থরিয়াম	${}_{90}Th^{234}$	β, γ	24.1 দিন
প্রোট্যাক্টিনিয়াম	${}_{91}Pa^{234}$	β, γ	1.14 মিনিট
রেডিয়াম্	${}_{88}Ra^{226}$	α, γ	1.62×10^{3} বছর
রেডন	${}_{86}Rn^{222}$	α	3.83 দিন
পলোনিয়াম	${}_{84}Po^{218}$	α, β	3.05 মিনিট
পলোনিয়াম	${}_{84}Po^{214}$	α	1.5×10^{-4} সেকেন্ড
লেড	${}_{82}Pb^{214}$	β, γ	26.8 মিনিট
লেড	${}_{82}Pb^{210}$	β, γ	22 বছর
লেড	${}_{82}Pb^{206}$	স্থিতিশীল	—

দেখা গেল পারমাণবিক সংখ্যা 83 পেরিয়ে গেলে আমাদের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা ধর্ম প্রকাশ পেতে থাকে। ব্যতিক্রম টেকনেশিয়াম ($Z = 43$) এবং প্রোমেথিয়াম ($Z = 61$)

গবেষকরা জানালেন যে জোড় পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌল বিজোড় পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের তুলনায় বেশি স্থিতিশীল, প্রকৃতিতে প্রাচুর্যের নিরিখে এগিয়ে এবং বেশি সমস্থানিক সম্পন্ন হয়। তাঁরা আরও বললেন যে কোনো মৌল পরমাণুর জোড় পারমাণবিক সংখ্যা (Z) এবং জোড় ভরসংখ্যা (A) ঐ মৌল পরমাণুর কেন্দ্রকের বাড়তি স্থিতিশীলতার কারণ ঘটায়। কোনো মৌলের প্রোটন সংখ্যা (Z) এবং নিউট্রন সংখ্যা (N) এমনকী Z অথবা

N যদি 2,8,20,50,82,126 সংখ্যা হয় তাহলে তা ঐ মৌল পরমাণুর কেন্দ্রকের বিশেষ সুস্থিতি সূচিত করে কারণ ঐ সংখ্যাগুলি প্রোটন বা নিউট্রনের বেলায় কেন্দ্রকে ভর্তিকোষ (Filled nuclear shells) গঠন করে। ঐ সংখ্যাগুলিকে বলা যায় 'যাদু সংখ্যা' (Magic number)। প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি যে কোনো মৌল পরমাণুর ভর্তি কক্ষ ইলেকট্রন বিন্যাসও (Closed shell electron configuration) ওই মৌলের রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তা নির্দেশ করে। অবশ্য কোনো মৌলের রাসায়নিক সক্রিয়তা তার মৌলিকত্ব খর্ব করে না। অর্থাৎ নূতন ধর্মসম্পন্ন যৌগ গঠন করলেও মৌলটি অন্য মৌলে রূপান্তরিত হয় না।

এইসব পটভূমিতে ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলদের জন্মদানের ব্যাপারে তোমাদের বিজ্ঞানীদের মধ্যে একপ্রকার প্রতিযোগিতা শুরু হয় বলা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও জার্মেনির গবেষণা কেন্দ্রে আমাদের বংশবৃদ্ধি ঘটাতে বিজ্ঞানীরা তৎপর হলেন। আমাদের সদস্য কারো কারো জন্ম হয়েছে, হচ্ছে একাধিক গবেষণা কেন্দ্রে। আমাদের সদস্যদের জন্মদানে এগিয়ে এসেছেন রসায়নবিদ, পদার্থবিদ, প্রযুক্তিবিদ। জন্মদাতা বিজ্ঞানিগণ তাদের পছন্দমতো ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলের নামকরণ করলেন ফলে কারো কারো একাধিক নামকরণে এক বিভ্রান্তির পরিবেশ তৈরি হল। অল্প বিস্তর বিতর্কও দানা বাঁধল। আন্তর্জাতিক বিশুদ্ধ ও ফলিত রসায়ন সংস্থা IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) এবং আন্তর্জাতিক বিশুদ্ধ ও ফলিত পদার্থবিদ্যা সংস্থা IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics) প্রথমদিকে ইউরেনিয়ামোত্তর ভারী মৌলের নামকরণের ব্যাপারে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। বর্তমানে IUPAC ও IUPAP এর মধ্যস্থতায় সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে ভারী মৌলগুলির নামকরণ করা হয়েছে, তবে সব নামই চূড়ান্ত হল কিনা আগামী দিনেই তা জানা যাবে। কারণ বিজ্ঞানী মহলে এ নিয়ে অভিযোগ অনুযোগ এখনও সম্পূর্ণ প্রশমিত হয় নি। প্রসঙ্গক্রমে তোমাদের বলতে পারি যে প্রকৃতিতে পাওয়া মৌলদের নামকরণেও কোনো কোনো মৌলের একাধিক নামের প্রস্তাব এসেছে আর আলোচনার মাধ্যমেই নাম চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে।

মৌলের জন্মদানের দিকে তাকালে দেখতে পাবে মৌলের কৃত্রিম রূপান্তর প্রথম সংঘটিত করেন ই. রাদারফোর্ড 1919 সালে। তিনি নাইট্রোজেনের উপর আলফা কণা বর্ষণ করে কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন পরমাণু উৎপন্ন করেন। সমীকরণের সাহায্যে বলা যায়ঃ

$$^{14}_{7}N + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{17}_{8}O + ^{1}_{1}H$$
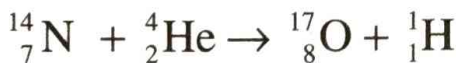
নাইট্রোজেন আলফা কণা অক্সিজেন প্রোটন

সংক্ষেপে ${}^{14}_{7}N(\alpha, \rho){}^{17}_{8}O$

1934 সালে এনরিকো ফার্মি (Enrico Fermi) বললেন যে কোনো মৌলের কেন্দ্রকে নিউট্রন কণার আঘাত নূতন মৌলের জন্ম দেবে। তিনিই ইউরেনিয়ামের উপর নিউট্রন বর্ষণ করে প্রথম ইউরেনিয়ামোত্তর নূতন মৌলের জন্ম দেন। নিউট্রন আত্তীকরণের (Neutron Capture) পর বিটা ভাঙনের মাধ্যমে নূতন মৌলের জন্ম হয়। বিটা ভাঙন (β-Decay) কার্যত পরমাণু কেন্দ্রকের নিউট্রন কণার প্রোটন ও ইলেকট্রন কণায় রূপান্তর, ইলেকট্রন কণার নিঃসরণ ও প্রোটন কণার কেন্দ্রকে সংযোজন নির্দেশ করে। ফলে ভরসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা এক একক বৃদ্ধি পায়।

$$ {}^{238}_{92}\cup + n \rightarrow {}^{239}_{92}\cup \xrightarrow{\beta} {}^{239}_{93} $$

ইউরেনিয়াম 238 সমস্থানিক	বিটা সক্রিয় ইউরেনিয়াম 239 সমস্থানিক	নূতন মৌল (অর্ধায়ু 2.3 দিন)
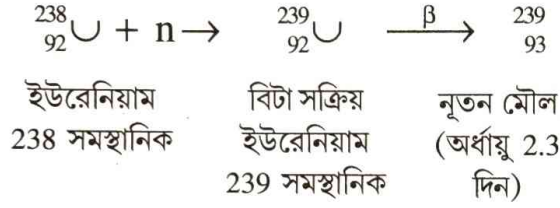
পৃথক করতে না পারায় ফার্মি নূতন মৌলটির জন্মদাতার মর্যাদা পান নি।

1936 সালে ই সেগ্রে (E. Segre) মলিবডেনাম ($Z = 42$) লক্ষ্যবস্তুর উপর ডয়টেরিয়াম (${}^{2}_{1}H$) বর্ষণ করে প্রথম মনুষ্য প্রস্তুত মৌল ($Z = 43$) প্রস্তুত করেন। কৃত্রিম পথ ধরে প্রথম সন্ধান মিলেছিল বলে মৌলটির নাম দেওয়া হয়েছিল টেকনেসিয়াম — তা তোমরা জান। প্রকৃতির রাজ্যে বিরাজিত মৌলদের মধ্যে কেন দু-চারটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, কেন কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ার পথ ধরে কৃত্রিম উপায়ে এদের ঠিকানায় পৌঁছোতে হয়েছিল, কেন ওই না-দেখা, না-পাওয়া মৌলগুলি বিজ্ঞানীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল তা তোমাদের বলব।

বার্কেলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ ই এম ম্যাকমিলান (E M Mcmillan) 1940 সালে ইউরেনিয়ামের উপর বেগবান নিউট্রন বর্ষণ করে বুঝতে পারেন যে ইউরেনিয়ামোত্তর নূতন মৌলের জন্ম হয়েছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে ম্যাকমিলান তাঁর রসায়নবিদ বন্ধু পি অ্যাবেলসনকে (P Abelson) আহ্বান জানান এবং দুই বন্ধু মিলে নূতন মৌলটি পৃথক করেন। ইউরেনাসের পরের গ্রহ নেপচুনের নামে তাঁরা মৌলটির নাম দেন নেপচুনিয়াম (Neptunium), রাসায়নিক চিহ্ন Np।

$$ {}^{238}_{92}\cup(n, 2n){}^{237}_{92}\cup \xrightarrow{\beta^-} {}^{237}_{93}Np $$
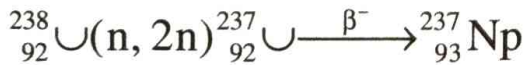
নেপচুনিয়াম (অর্ধজীবন 2.2×10^6 বছর)

বর্তমানে নেপচুনিয়ামের তেরোটি সমস্থানিকের অস্তিত্বের কথা বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন ।এর মধ্যে নেপচুনিয়াম-237 সমস্থানিকটি অধিক অর্ধজীবন বিশিষ্ট এবং 1952 সালে প্রকৃতিতে ইউরেনিয়াম খনিজে ধরা দেয়। তাই প্রকৃতির মৌল গড়ার খেলা 92 পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট মৌল ইউরেনিয়ামেই সমাপ্ত হয়ে গেছে বলা কি যথার্থ হবে?

জি টি সিবর্গ (G T Seaborg) ও তাঁর সহকর্মিগণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল সংশ্লেষণ করেন। 1940 সালে U-238 সমস্থানিকের উপর ডয়টেরন বর্ষণ করে তাঁরা 238 ভর-সংখ্যা বিশিষ্ট 94 নম্বর মৌলের সন্ধান পান, যার অর্ধজীবন 50 বছর। মৌলটির নাম দেওয়া হয় প্লুটোনিয়াম (Plutonium), সৌরজগতে নেপচুনের পরবর্তী গ্রহ প্লুটোর নামে, রাসায়নিক চিহ্ন Pu।

$$^{238}_{92}\cup + ^{2}_{1}H \rightarrow ^{238}_{93}Np + 2n \xrightarrow{\beta^-} ^{238}_{94}Pu$$

প্লুটোনিয়াম

শুনতে পাই প্লুটোর গ্রহের মর্যাদা তোমরা কেড়ে নিতে যাচ্ছ। মৌলটি কিন্তু ঐ নামেই যথেষ্ট পরিচিতি অর্জন করেছে। 1941 সালে 24360 বছর অর্ধজীবন বিশিষ্ট Pu 239 সমস্থানিক সংশ্লেষিত হয়। ধীরগতি সম্পন্ন নিউট্রনের প্রভাবে এটির বিভাজনের তীব্রতা U 235-এর চেয়ে অনেক বেশি। তাই সমর বিজ্ঞানের অন্দর মহলে মৌলটি মহাসমাদরে ঠাঁই করে নিয়েছে। বিভিন্ন দেশ-এর গবেষণায় গভীর গোপনীয়তা অবলম্বন করে চলেছে। P -239 ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলের সংশ্লেষণে লক্ষ্যবস্তুর ভূমিকাও পালন করে। এসব কারণে প্লুটোনিয়াম গবেষণার বহর এত বেড়ে গেছে যে পৃথিবীতে বিদ্যমান অনেক স্থায়ী মৌলের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে এটি প্রস্তুত করা হচ্ছে। বর্তমানে প্লুটোনিয়ামের 17টি সমস্থানিক জানা আছে। নেপচুনিয়ামের মতো Pu 239 সমস্থানিকের অস্তিত্বও প্রকৃতিতে — ইউরেনিয়াম খনিজে ধরা পড়েছে।

1944 সালে সিবর্গ এবং তাঁর সহকর্মীরা Pu- 239 লক্ষ্যবস্তুতে ত্বরণ যুক্ত আলফা কণা বর্ষণ করেন। প্লুটোনিয়াম লক্ষ্যবস্তু থেকে একাধিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং দক্ষ রাসায়নিক বিশ্লেষণে 242 ভর সংখ্যা বিশিষ্ট 96 নম্বর মৌলটি ধরা পড়ে। অর্থাৎ 96 সংখ্যক মৌলটি 95 সংখ্যক মৌলটির আগেই বিজ্ঞানীদের কাছে আত্মপ্রকাশের জানান দেয়।

$$^{239}_{94}Pu\ (\alpha, n)\ ^{242}_{96}$$
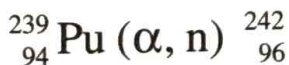
(অর্ধায়ু 162 দিন)

1945 সালে প্লুটোনিয়ামের উপর নিউট্রন বর্ষণ করে উৎপন্ন বস্তু থেকে 95 নম্বর মৌলটি নিষ্কাশিত করা হয়। নিউট্রন আত্তীকরণের পর বিটা-ভাঙনের পথ ধরে Pu 239, 95 নম্বর মৌলে পরিণত হয়।

$$^{239}_{94}\text{Pu} + \text{n} \rightarrow {}^{240}_{94}\text{Pu} \rightarrow {}^{241}_{94}\text{Pu} \xrightarrow{\beta^-} {}^{241}_{95}$$
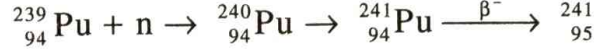
আমেরিকার নামে 95 সংখ্যক মৌলটির নাম দেওয়া হয় আমেরিসিয়াম (Americium), রাসায়নিক চিহ্ন Am। 96 সংখ্যক মৌলটির নামকরণ করা হয় কুরি দম্পতি পিয়ারে কুরি ও ম্যারি কুরির (Pierre and Marie Curie) সম্মানার্থে কুরিয়াম (Curium), রাসায়নিক চিহ্ন Cm। বর্তমানে আমেরিসিয়ামের 11টি এবং কুরিয়ামের 13টি সমস্থানিক জানা আছে। মৌল দুটির দীর্ঘতম জীবন বিশিষ্ট সমস্থানিক হল আমেরিসিয়াম 243 (অর্ধজীবন 7950 বছর) এবং কুরিয়াম 247 (অর্ধজীবন 1.64×10^7 বছর)।

97 সংখ্যক মৌলটির নামকরণ করা হয় বার্কেলে শহরের নামে বার্কেলিয়াম (Barkelium), রাসায়নিক চিহ্ন Bk। সিবর্গের দলটি 1949 সালে আমেরিসিয়াম - 241 সমস্থানিকের উপর আলফা কণা বর্ষণ করে বার্কেলিয়াম প্রস্তুত করেন।

$$^{241}_{95}\text{Am}\,(\alpha, 2\text{n})\ {}^{243}_{97}\text{Bk}$$
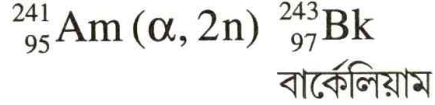
বার্কেলিয়াম

বর্তমানে জানা বার্কেলিয়ামের 9টি সমস্থানিকের মধ্যে দীর্ঘতম জীবন বিশিষ্ট (অর্ধজীবন 1380 বছর) বার্কেলিয়াম 247 সমস্থানিকটি 1956 সালে সংশ্লেষিত হয়।

1950 সালে সিবর্গ ও তাঁর সহকর্মিগণ কুরিয়াম 242 সমস্থানিকের মাধ্যমে 98 নম্বর মৌলটি সংশ্লেষণ করেন। মৌলটির নাম দেওয়া হয় ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানার্থে ক্যালিফোর্নিয়াম (Californium), রাসায়নিক চিহ্ন Cf।

$$^{242}_{96}\text{Cm}\,(\alpha, \text{n})\ {}^{245}_{98}\text{Cf}$$
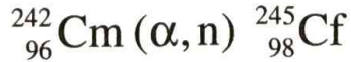
ক্যালিফোর্নিয়ামের জানা 14টি সমস্থানিকের মধ্যে দীর্ঘতম জীবন বিশিষ্ট (অর্ধজীবন 900 বছর) সমস্থানিক ক্যালিফোর্নিয়াম -251 সংশ্লেষিত হয় 1954 সালে।

99 এবং 100 সংখ্যক মৌল দুটির জন্মবার্তা প্রকাশিত হয় খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে, অজান্তে এবং কোনোরকম পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1952 সালের 1 নভেম্বর প্রশান্ত মহাসাগরের এনিউয়েটক (Eniwetok) প্রবালদ্বীপে একটি তাপ-পরমাণু বোমা "Mike"-

চিত্র - 4; তাপ-পরমাণু বোমা 'Mike'-এর পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণজাত ইউরেনিয়াম সমস্থানিক এবং এদের বিটা-স্থিতিশীল কেন্দ্রকে রূপান্তর।
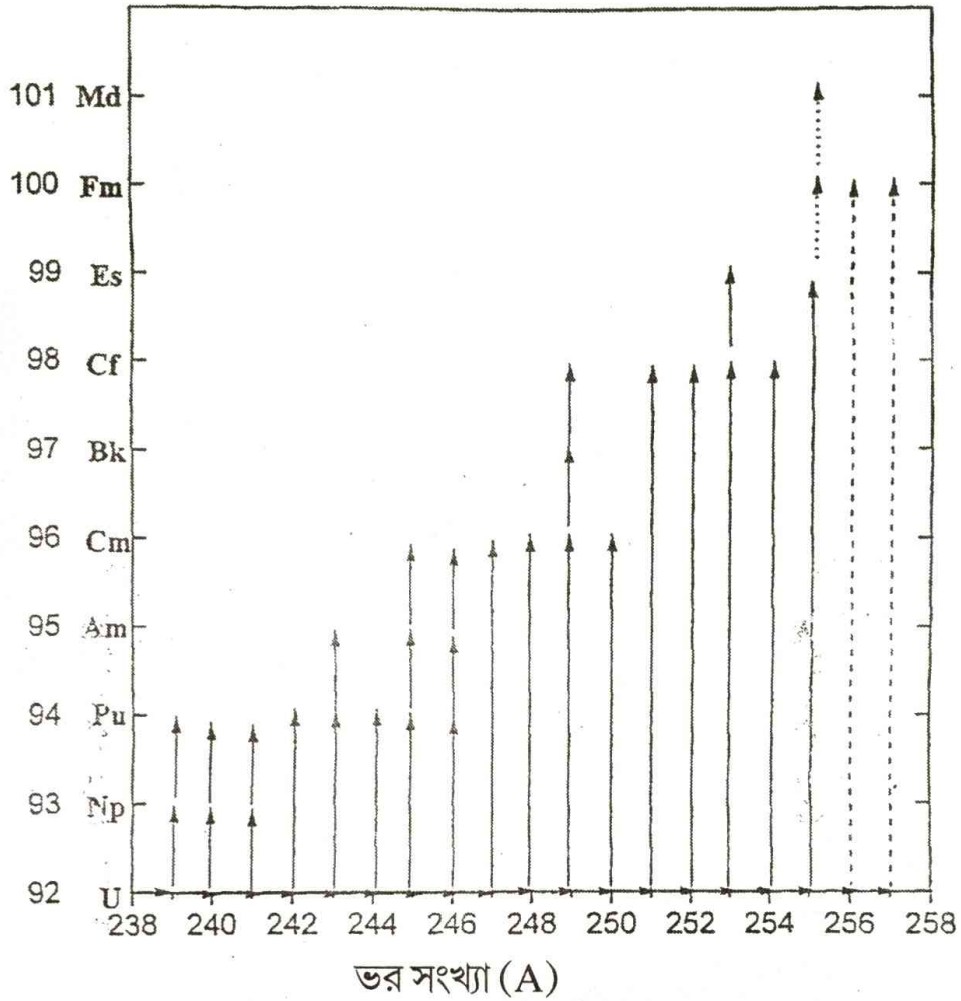
এর পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণ ক্ষেত্র থেকে সতর্কতার সঙ্গে কয়েকশো কিলোগ্রাম মাটি সংগ্রহ করে আমেরিকায় নিয়ে আসা হয়। বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে এই তেজস্ক্রিয় আবর্জনা পরীক্ষা করেন সিবর্গ, গিয়োর্সো (Giorso) এবং তাঁদের সহকর্মিগণ। মহা বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁরা আবর্জনায় 99 এবং 100 সংখ্যক মৌল দুটির সন্ধান পেলেন। তাপ-পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ জাত অতি তীব্র নিউট্রন প্রবাহ ইউরেনিয়ামের অধিক সংখ্যায় নিউট্রন আত্তীকরণ ঘটায়, অধিক ভর সংখ্যার ইউরেনিয়াম সমস্থানিক উৎপন্ন হয়, যা বিটা -ভাঙনের মাধ্যমে ইউরেনিয়ামোত্তর বিভিন্ন মৌলের সমস্থানিক সহ 99 এবং 100 নম্বর মৌলের 253_{99} এবং 255_{100} সমস্থানিকে পরিণত হয় (চিত্র 4)। 99 এবং 100 সংখ্যক মৌলের আয়ু দীর্ঘ ছিল না, প্রথমটির অর্ধজীবন 20 দিন, দ্বিতীয়টির 20 ঘণ্টা। এদের নামকরণ করা হয়েছিল যথাক্রমে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের (Albert Einstein) সম্মানার্থে আইনস্টাইনিয়াম (Einsteinium), রাসায়নিক চিহ্ন Es এবং ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলের জন্মদানের পুরোধা

এনরিকো ফার্মির সম্মানার্থে ফার্মিয়াম (Fermium), রাসায়নিক চিহ্ন Fm। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই নামকরণের সময় বিজ্ঞানী দুজনই জীবিত ছিলেন। যদিও জীবিত অবস্থায় এমন সম্মান প্রদর্শনের রেওয়াজ নেই তবুও বিজ্ঞানিদ্বয়ের মান মর্যাদা বিবেচনায় কোনো ওজর-আপত্তি ওঠে নি। পরবর্তী সময়ে অধিক অর্ধজীবন বিশিষ্ট আইনস্টাইনিয়াম 252 সমস্থানিক (অর্ধজীবন 401 দিন) এবং ফার্মিয়াম 257 সমস্থানিক (অর্ধজীবন 80 দিন) সংশ্লেষিত হয়।

1955 সালে সিবর্গ ও তাঁর সহযোগিগণ নগণ্য পরিমাণ আইনস্টাইনিয়াম - 253 লক্ষ্যবস্তুর উপর আলফা কণা বর্ষণ করে 101 সংখ্যক মৌলটি সংশ্লেষণ করেন।

$$^{253}_{99}\mathrm{Es}\,(\alpha, n)\; 256_{101}$$
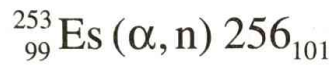
অর্ধজীবন 1.5 ঘণ্টা

মৌলটির নাম, রাসায়নিক মৌলের পর্যায় সারণির (Periodic Table of Chemical Elements) অন্যতম জনক রসায়নবিদ ডি মেন্ডেলেয়েভের (D Mendeleyev) সম্মানার্থে দেওয়া হয় মেন্ডেলিভিয়াম (Mendelevium), রাসায়নিক চিহ্ন Md।

ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলের সংশ্লেষণে ও নামকরণে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের দাবি ও পাল্টা দাবি কখনও তোমাদের 'কবির লড়াই'-এর রূপ ধারণ করে। 1957 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'Argonne National Laboratory" ইংল্যান্ডের 'The Atomic Energy Research Establishment' এবং স্টকহল্‌মের 'The Nobel Institute of Physics' -এর বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক দল কুরিয়াম 244 লক্ষ্যবস্তুর উপর কার্বন 13 আয়ন বর্ষণ করেন। উৎপন্ন বস্তুতে তাঁরা 10 মিনিট অর্ধজীবন বিশিষ্ট 253_{102} এবং 251_{102} দুটি সমস্থানিকের উপস্থিতির দাবি করেন। নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক আলফ্রেড নোবেলের (Alfred Nobel) সম্মানার্থে তাঁরা মৌলটির নাম দেন নোবেলিয়াম (Nobelium), রাসায়নিক চিহ্ন No, যদিও তাঁদের দাবি অভ্রান্ত প্রমাণিত হয় নি।

1957 সালে জি ফ্লেরভ (G. Flerov)-এর নেতৃত্বে একদল রুশ বিজ্ঞানী দুব্‌নার (রাশিয়া) 'The Joint Institute for Nuclear Research' (JINR)-এ প্লুটোনিয়াম 244 লক্ষ্যবস্তুতে অক্সিজেন আয়ন বর্ষণ করেন। উৎপন্ন বস্তুতে তাঁরাও 102 সংখ্যক মৌলের উপস্থিতির দাবি করেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানিগোষ্ঠীর বিবরণের সঙ্গে তাঁদের ফলাফলের কোনো সঙ্গতি ছিল না। ইতিমধ্যে গিয়োর্সোর নেতৃত্বে বার্কেলের একদল বিজ্ঞানী 102 নম্বর মৌলটি সংশ্লেষণে মনোনিবেশ করেন। তাদের পর্যবেক্ষণ স্টকহল্‌মের ফলাফলকে বাতিল করে এবং রুশ ফলাফলের সঙ্গেও অসহমত পোষণ করে। প্রস্তাবিত নোবেলিয়াম নামধারী

102 নম্বর মৌলটি নিয়ে একটি রসিকতা চালু হয়। তোমরা একটা গান কর-না — "তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই।" তেমনি বিজ্ঞানী সমাজেরও কিছু সমালোচক যেন বলতে থাকলেন ঃ

"নোবেলিয়ামের দেখা নাই রে,
নোবেলিয়ামের দেখা নাই,
শুধু রইল পড়ে 'নো-বে-লি-য়া-মের —
'নো' (No), নো, নো।"

1965 সালে ফ্লেরভের দলটি নিশ্চিতভাবে 102 সংখ্যক মৌলের একাধিক সমস্থানিক সংশ্লেষণ করেন এবং সমস্থানিকগুলির ভরসংখ্যা ও অর্ধজীবন নির্ণয় করেন। এমনকী তাঁরা মৌলটির নাম, এফ জোলিও কুরির (F. Joliot Curie) সম্মানে, দেন জোলিয়োশিয়াম (Joliotium), চিহ্ন Jl।

গিয়োর্সো ও তাঁর সহকর্মিগণ কুরিয়াম 246 লক্ষ্যবস্তুতে কার্বন 12 আয়ন বর্ষণ করে উৎপন্ন বস্তুতে 254_{102} সমস্থানিক শনাক্ত করেন। তাঁরা রুশ বিজ্ঞানীদের পরিবর্ধিত কাজের ফলাফলের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন কিন্তু জোলিয়োশিয়াম নামকরণে আপত্তি তোলেন। যেহেতু আগে মৌলটির নাম নোবেলিয়াম প্রস্তাব করা হয়েছিল তাই ওই নামটিই এখন ব্যবহৃত হচ্ছে।

বর্তমানে নোবেলিয়ামের জানা 9টি সমস্থানিকের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘজীবন বিশিষ্ট (অর্ধজীবন 1 ঘণ্টা) সমস্থানিকটি হল $^{259}_{102}No$ ।

1961 সালে গিয়োর্সো এবং তাঁর সহকর্মিগণ ক্যালিফোর্নিয়াম 251 লক্ষ্যবস্তুর উপর বোরন আয়ন বর্ষণ করে 8 সেকেন্ড অর্ধজীবন বিশিষ্ট 257_{103} সমস্থানিক সংশ্লেষণ করেন। মৌলটির নাম সাইক্লোট্রন যন্ত্রের স্রষ্টা ই ও লরেন্সের (E O Lawrence) সম্মানার্থে লরেন্সিয়াম (Lawrencium) রাখা হয়, রাসায়নিক চিহ্ন Lr।

$$^{251}_{98}Cf\left(^{11}_{5}B, 5n\right)^{257}_{103}Lr$$
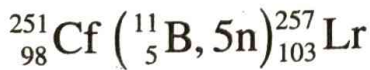
দুব্‌নার বিজ্ঞানিগণও আমেরিসিয়াম-243 লক্ষ্যবস্তুর উপর অক্সিজেন আয়ন বর্ষণ করে লরেন্সিয়াম 256 সমস্থানিকটি সংশ্লেষণ করেন।

$$^{243}_{95}Am\left(^{18}_{8}O, 5n\right)^{256}_{103}Lr$$
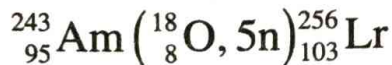
ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলের যাত্রা লরেন্সিয়াম মৌলে এসে থামল। অর্থাৎ অ্যাকটিনাইড সারি

(Actinide Series) সম্পূর্ণ হল। আমাদের বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া কি তাহলে সমাপ্ত হল!

বিজ্ঞানীরা কিন্তু থামলেন না। মৌল সংখ্যা (Z) বাড়ার সঙ্গে নবজাত মৌলের আয়ুর জোর যে নিদারুণ ভাবে কমে আসছিল তা বিজ্ঞানীরা বুঝতে পাচ্ছিলেন। তবুও আধুনিক পর্যায় সারণির শূন্যস্থানগুলি যেন তাঁদের শূন্যস্থান পূরণের পথে প্ররোচিত করছিল। বিজ্ঞানিগণ অ্যাকটিনাইড-উত্তর (Transactinide) মৌলের জন্মদানে মগ্ন হলেন।

অ্যাকটিনাইড-উত্তর মৌলের জন্মদানের ও নামকরণের ব্যাপারটা খুব একটা মসৃণ ছিল বলা যাবে না। 104 এবং 105 সংখ্যক মৌল দুটি নিয়ে বার্কেলে ও দুব্‌নার বিজ্ঞানীদের মধ্যে দাবি, পালটা দাবির লড়াই বেঁধে গেল — বলা চলে।

1957 সালে দুব্‌নার বিজ্ঞানিগণ প্লুটোনিয়াম 242 লক্ষ্যবস্তুটিতে ত্বরণযুক্ত নিয়ন 22 আয়ন বর্ষণ করেন এবং উৎপন্ন বস্তুকে $^{260}_{104}$ বলে দাবি করেন। তাঁরা মৌলটির নাম,

$$^{242}_{94}\text{Pu}\left(^{22}_{10}\text{Ne}, 4\text{n}\right)^{260}_{104}$$
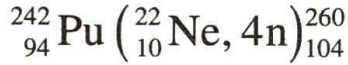
সোভিয়েত ইউনিয়নের পারমাণবিক কর্মসূচীর নেতা আই কুর্চাটোভের (I Kurchatov) সম্মানার্থে, দেন কুর্চাটোভিয়াম (Kurchatovium), রাসায়নিক চিহ্ন Ku। সমস্থানিকটির অর্ধায়ু ছিল অতি কম, মাত্র 14 মিলিসেকেন্ড। স্বভাবতই এত স্বল্প আয়ু সম্পন্ন সমস্থানিকটির সঠিক শনাক্তকরণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। রুশ বিজ্ঞানিগণও তা মেনে নেন। তাঁরা 1964 সালে চল্লিশ ঘণ্টা ধরে প্লুটোনিয়াম লক্ষ্যবস্তুতে নিয়ন আয়ন বর্ষণ করে তুলনামূলকভাবে বেশি অর্ধায়ু বিশিষ্ট (গড়ে 0.3 সেকেন্ড) 104 সংখ্যক মৌলের একাধিক সমস্থানিক সংশ্লেষণ করেন; প্রস্তুত করেন দীর্ঘতম আয়ুবিশিষ্ট (অর্ধায়ু 1 মিনিট) $^{261}_{104}$ সমস্থানিকটি।

1969 সালে গিয়োর্সো ও তাঁর সহকর্মিগণ ক্যালিফোর্নিয়াম 249 লক্ষ্য বস্তুতে কার্বন 12 এবং কার্বন 13 আয়ন বর্ষণ করে যথাক্রমে $^{257}_{104}$ এবং $^{259}_{104}$ সমস্থানিক দুটি সংশ্লেষণ করেন।

$$^{249}_{98}\text{Cf}\left(^{12}_{6}\text{C}, 4\text{n}\right)^{257}_{104}$$

$$^{249}_{98}\text{Cf}\left(^{13}_{6}\text{C}, 3\text{n}\right)^{259}_{104}$$
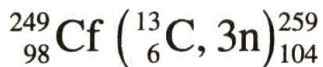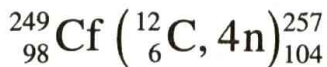
তাঁরা 104 নম্বর মৌলটির নাম দেন পরমাণু কেন্দ্রক মতবাদের প্রবক্তা ই রাদারফোর্ডের সম্মানার্থে রাদারফোর্ডিয়াম (Rutherfordium), রাসায়নিক চিহ্ন Rf। রাদারফোর্ডিয়াম নামটিই এখন গৃহীত হয়েছে।

1970 সালে ফ্লেরভ ও তাঁর সহযোগিগণ দুব্‌নাতে আমেরিসিয়াম 243 লক্ষ্যবস্তুতে ত্বরণযুক্ত নিয়ন বর্ষণ করে 2 সেকেন্ড অর্ধজীবন বিশিষ্ট $^{260}_{105}$ সমস্থানিকটি সংশ্লেষণ করেন।

$$^{243}_{95}\text{Am}\left(^{22}_{10}\text{Ne}, 5\text{n}\right)^{260}_{105}$$
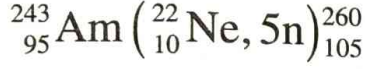
তাঁরা 105 নম্বর মৌলটির নাম দেন নিলস্‌বোরিয়াম (Nielsbohrium) — পরমাণু গঠন মতবাদের প্রবক্তা ড্যানিশ পদার্থবিদ নিলস্ বোরের (Niels Bohr) নামানুসারে, রাসায়নিক চিহ্ন Ns।

1970 সালেই গিয়োর্সোর দল ক্যালিফোর্নিয়াম 249 এবং 250 লক্ষ্যবস্তুতে নাইট্রোজেন 15 আয়ন বর্ষণ করে $^{260}_{105}$ এবং $^{261}_{105}$ সমস্থানিক দুটি শনাক্ত করেন।

$$^{249}_{98}\text{Cf}\left(^{15}_{7}\text{N}, 4\text{n}\right)^{260}_{105}$$

$$^{250}_{98}\text{Cf}\left(^{15}_{7}\text{N}, 4\text{n}\right)^{261}_{105}$$
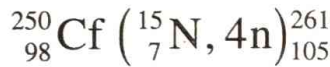
তাঁরা 105 সংখ্যক মৌলটির নাম প্রস্তাব করেন পরমাণু বিজ্ঞানী ওটো হ্যানের (Otto Hahn) নামানুসারে হ্যানিয়াম (Hahnium), রাসায়নিক চিহ্ন Ha। দুব্‌না শহরের নামানুসারে মৌলটির নাম গৃহীত হয় দুব্‌নিয়াম (Dubnium), রাসায়নিক চিহ্ন Db। কারণ দুব্‌না থেকেই মৌলটির জন্মবার্তা, ‘প্রথম’ প্রকাশিত হয়।

1974 সালে গিয়োর্সোর নেতৃত্বে বার্কেলের বিজ্ঞানিগণ ক্যালিফোর্নিয়াম 249 লক্ষ্যবস্তুতে ত্বরণযুক্ত অক্সিজেন 18 আয়ন বর্ষণ করে $^{263}_{106}$ সমস্থানিকটি সংশ্লেষণ করেন এবং 106 সংখ্যক মৌলটির নাম দেন জি টি সিবর্গের সম্মানার্থে সিবর্গিয়াম (Seaborgium), রাসায়নিক চিহ্ন Sg। এই নামকরণ নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। কারণ সিবর্গ তখন জীবিত। কথা ওঠে জীবিত অবস্থায় এমন সম্মান প্রদর্শন নীতি বিরুদ্ধ, যদিও আইনস্টাইন ও ফার্মির ক্ষেত্রে এমন কথা ওঠে নি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত সিবর্গিয়াম নামটিই গৃহীত হয়।

$$^{249}_{98}\text{Cf}\left(^{18}_{8}\text{O}, 4\text{n}\right)^{263}_{106}\text{Sg}$$
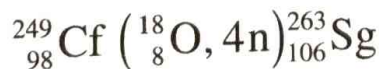
দুব্‌নার বিজ্ঞানিগণ বিসমাথ 209 লক্ষ্যবস্তুতে ত্বরণযুক্ত ক্রোমিয়াম আয়ন বর্ষণ করে 107 নম্বর মৌলের একটি সমস্থানিকের জন্মদানের দাবি করেন।

$$^{209}_{83}\text{Bi} + ^{54}_{24}\text{Cr} \rightarrow ^{261}_{107} + 2\text{n}$$
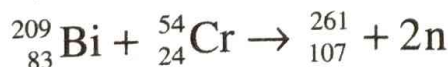
নূতন মৌলের নামকরণ পর্ব সমাধা হবার সাপেক্ষে স্থায়ী দুটি মৌলের কেন্দ্রকীয় সংযোজনে গঠিত বস্তুকে যৌগ-কেন্দ্রক (Compound nucleus) আখ্যা দেওয়া হল।

জার্মানির ডারমস্ট্যাডট্ ভারী আয়ন গবেষণা সংস্থার (Gesellschaft für Schwerionenforschung) বিজ্ঞানী পিটার আরমব্রুস্টার (Peter Armbruster) ও তাঁর সহকর্মিগণ 107 থেকে 112 সংখ্যক মৌল সংশ্লেষণের দাবি করেন। তাঁরা বিসমাথ 209 লক্ষ্যবস্তুতে ত্বরণযুক্ত ক্রোমিয়াম 54 আয়ন বর্ষণ করে $^{262}{}_{107}$ সমস্থানিকটি সংশ্লেষণ করেন। নূতন মৌলটির নাম দেন নিলস্ বোরিয়াম, যা দুব্‌নার বিজ্ঞানিগণ 105 নম্বর মৌলের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। 107 নম্বর মৌলের নাম গৃহীত হয়েছে বোরিয়াম (Bohrium), রাসায়নিক চিহ্ন Bh।

$$^{209}_{83}\mathrm{Bi} + \left(^{54}_{24}\mathrm{Cr}, \mathrm{n}\right)^{262}_{107}\mathrm{Bh}$$

1980 সালে আরমব্রুস্টারের দল লেড 209 লক্ষ্যবস্তুতে ত্বরণযুক্ত আয়রন 58 আয়ন বর্ষণ করে প্রস্তুত করেন $^{265}{}_{108}$ সমস্থানিকটি। 108 নম্বর মৌলটির নাম দেওয়া হয় হ্যাসিয়াম (Hassium), রাসায়নিক চিহ্ন Hs, জার্মানির হ্যাসে (Hesses) রাজ্যের নামানুসারে, যেখানকার গবেষণাগারে মৌলটির জন্ম দেওয়া হয়।

$$^{209}_{82}\mathrm{Pb} + \left(^{58}_{26}\mathrm{Fe}, \mathrm{n}\right)^{265}_{108}\mathrm{Hs}$$

1980 সালেই বিসমাথ 209 লক্ষ্যবস্তুতে ত্বরণযুক্ত আয়রন 58 আয়ন বর্ষণ করে তাঁরা সংশ্লেষণ করেন 109 নম্বর মৌলের সমস্থানিক $^{266}{}_{109}$, নাম দেন লিজে মেইটনারের (Lise Meitner) সম্মানার্থে মেইটনারিয়াম (Meitnerium), রাসায়নিক চিহ্ন Mt।

$$^{209}_{83}\mathrm{Bi}\left(^{58}_{26}\mathrm{Fe}, \mathrm{n}\right)^{266}_{109}\mathrm{Mt}$$

1994 সালে জার্মানির বিজ্ঞানিগণ লেড 208 লক্ষ্যবস্তুতে ত্বরণযুক্ত নিকেল 62 এবং 64 আয়ন বর্ষণ করে 110 নম্বর মৌলের দুটি সমস্থানিকের জন্মদানের দাবি করেন। তাঁরা মৌলটির নাম দেন জার্মানির ডারমস্টাড্‌ট শহরের নামানুসারে ডারমস্টাড্‌টিয়াম (Darmstadtium), রাসায়নিক চিহ্ন Ds কারণ ঐ শহরের পরীক্ষাগারেই মৌলটির জন্ম হয়েছিল।

$$^{208}_{82}\mathrm{Pb}\ \left(^{62}_{28}\mathrm{Ni}, \mathrm{n}\right)^{269}_{110}\mathrm{Ds}$$

$$^{208}_{82}\mathrm{Pb}\ \left(^{64}_{28}\mathrm{Ni}, \mathrm{n}\right)^{271}_{110}\mathrm{Ds}$$

1994 সালেই আরমব্রুস্টারের দল বিসমাথ 209 লক্ষ্যবস্তুতে ত্বরণযুক্ত নিকেল 64 আয়ন বর্ষণ করে 272 ভরসংখ্যা বিশিষ্ট 111 নম্বর মৌলের জন্ম দেন। মৌলটির নামকরণ করা হয় X-রশ্মির আবিষ্কারক রন্টজেনের (W C Röntgen) সম্মানার্থে রয়েন্টজেনিয়াম (Roentgenium), রাসায়নিক চিহ্ন Rg।

$$^{209}_{83}\text{Bi}\ \left(^{64}_{28}\text{Ni, n}\right)^{272}_{111}\text{Rg}$$

জার্মানির বৈজ্ঞানিকগোষ্ঠীই 1996 সালে লেড 208 লক্ষ্যবস্তুতে ত্বরণযুক্ত জিংক 70 আয়ন বর্ষণ করে 112 নম্বর মৌলের জন্মদানের সংবাদ দেন। মৌলটির নামকরণ পর্ব চলেছে।

$$^{208}_{82}\text{Pb}\ \left(^{70}_{30}\text{Zn, n}\right)^{277}_{112}$$
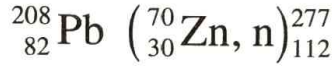
মৌল সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে মৌলের নিদারুণ আয়ু হ্রাসের হতাশাজনক পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানীরা যেন একটু আশার আলো দেখতে পেলেন এবং 'পর্যায় সারণির' শূন্যস্থানগুলি পূরণের ভরসা পেলেন।

দেখা গেল 20টি প্রোটন এবং 20টি নিউট্রন নিয়ে গঠিত ক্যালসিয়াম 40 সমস্থানিক, 82টি প্রোটন এবং 126টি নিউট্রন নিয়ে গঠিত লেড 208 সমস্থানিক খুবই স্থিতিশীল আর তার থেকেই বিজ্ঞানীরা প্রত্যাশা করলেন যে 114 সংখ্যক মৌলের 114টি প্রোটন এবং 184টি নিউট্রন নিয়ে গঠিত সমস্থানিকটি স্থিতিশীল হবে। অর্থাৎ উচ্চ পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট তীব্র তেজস্ক্রিয় মৌলের মধ্যে অদ্ভুত 'স্থায়িত্ব বিশিষ্ট দ্বীপ' (Island of Stability) থাকতে পারে, দ্বীপের বাসিন্দা মৌলগুলি প্রতিবেশী মৌলের তুলনায় হবে বেশি স্থিতিশীল। এই ভাবনা — বিস্মরণে তলিয়ে যাওয়া তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী সুইনের ভবিষ্যদ্বাণী মনে করিয়ে দেয়। বিজ্ঞানজগতে এমনটি বোধহয় ঘটেই থাকে। নূতন কথাবার্তা, ভাবনা-চিন্তা, নূতন মতবাদ যেন বরাবরই সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, বিজ্ঞানের অন্দরমহলে এদের ঠাঁই পেতে অনেক বন্ধুর পথ পেরোতে হয়।

বার্কেলের বিজ্ঞানিগণ প্লুটোনিয়াম 244 এবং কুরিয়াম 248 লক্ষ্যবস্তুতে ক্যালসিয়াম 48 আয়ন বর্ষণ করে যথাক্রমে 114 সংখ্যক এবং 116 সংখ্যক মৌল সংশ্লেষণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন।

$$^{244}\text{Pu}\ \left(^{48}\text{Ca, 4n}\right)^{288}_{114}$$

$$^{248}\text{Cm}\ \left(^{48}\text{Ca, 4n}\right)^{292}_{116}$$
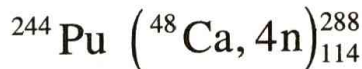
দুব্‌নার বিজ্ঞানিগণ নিউট্রন সমৃদ্ধ দীর্ঘ অর্ধায়ু বিশিষ্ট প্লুটোনিয়াম (Z = 94), আমেরিসিয়াম (95), কুরিয়াম (96) এবং ক্যালিফোর্নিয়াম (98) সমস্থানিকের সঙ্গে ক্যালসিয়াম 48 আয়নের সংযোজন ঘটিয়ে 112 থেকে 118 সংখ্যক মৌলের জন্ম দেবার দাবি করছেন। মৌলগুলির জন্মকথা বিজ্ঞানীমহল অনুমোদন করলে এদের নামকরণ চূড়ান্ত রূপ পাবে আশা করা যায়। আপাতত এদের জন্য সুসম্বদ্ধ নাম বরাদ্দ করা হয়েছে (সারণি - 4)

সারণি - 4 ঃ 112 থেকে 118 সংখ্যক মৌলের সুসম্বদ্ধ নাম

মৌল সংখ্যা	নাম	চিহ্ন
112	Ununbium Un = 1, un = 1, bium = 2 অর্থাৎ 112 নম্বর মৌল	Uub
113	Ununtrium	Uut
114	Ununquadium	Uuq
115	Ununpentium	Uup
116	Ununhexium	Uuh
117	Ununseptium	Uus
118	Ununoctium	Uuo

তোমরা হয়তো বলবে যে আমাদের বংশবিস্তার এবার কি তাহলে বাস্তবিকই শেষ হল। কারণ বর্তমান ‘পর্যায় সারণিতে’ আর তো কোনো ঘর খালি নেই। শেষের কথা তোমাদের শেষেই বলব। বস্তুত শেষ কোথায় — কে বলতে পারে!

আমাদের কথা মূলত বিজ্ঞানীদের জবানির ভিত্তিতেই তোমাদের বলে এসেছি আর বলতে তো হবেই। কারণ তোমাদের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা- নিরীক্ষা করা — কাজের লোক। কাজের কথা বলতেই তাঁরা পছন্দ করেন। তাছাড়া তোমরা তো জান নিজেদের সুখ্যাতি নিজেদের গাইতে নেই। শুনতে পাই তোমাদের অনেকে নিজেরাই নিজেদের জয়গান করতে থাক অথচ তোমরাই বল — “লোকে যারে বড়ো বলে বড়ো সে হয়।”

আমাদের নামধাম অনেকটাই তোমরা জেনে গেছ। আর বিজ্ঞানীদের জন্ম দেওয়া মৌলগুলির নামধামের সঙ্গে এদের জন্ম প্রক্রিয়াও তোমাদের জানা হয়ে গেছে। এবার প্রকৃতিতে বিদ্যামান

সদস্যদের সংঙ্গে তোমাদের পূর্বপুরুষদের কখন কীভাবে পরিচয় ঘটল তা কতকটা জানিয়ে দিই।

তোমাদের আগেই বলেছি যে জল, বায়ু, মাটি, ভূপৃষ্ঠ, ভূগর্ভ সর্বত্রই আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছি কোথাও কেউ কেউ মুক্ত অবস্থায়, আবার কোথাও অন্যদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে। ভূগর্ভের বিভিন্ন খনিজকে বলা হয়ে থাকে বিভিন্ন মৌলের গুপ্ত ভাণ্ডার।

পরিচয়-পরিচিতির পর্বে দেখা যায় প্রাচীনকালে ব্যবহারের ভিত্তিতে আমাদের কেউ কেউ তোমাদের সমাজে প্রবেশ করেছিল। মধ্যযুগেও তোমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আমাদের কারো কারো পরিচয় ঘটেছিল। জল ও বায়ুতে বিদ্যমান মৌলগুলি বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা দিল। রাসায়নিক বিশ্লেষণের পথ ধরে পরিচয় হয়েছে বেশ কিছু মৌলের। আমাদের পরিচয় পেতে তড়িৎ-রাসায়নিক ও বর্ণালি-বীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ রসায়নবিদদের সহায়তা করেছে। আবার 'পর্যায় সারণি' থেকে নূতন মৌলের ভবিষ্যদ্বাণীও রসায়নবিদদের মৌল আবিষ্কারে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

আমাদের পরিচয় তুলে ধরার আগে তোমাদের দু'একটি কথা বলে নিলে মনে হয় সুবিধা হবে। তোমরা জান অবস্থার নিরিখে আমরা কেউ কঠিন, কেউ তরল আবার কেউ গ্যাসীয়। তেমনি গুণাবলীর নিরিখে কেউ ধাতু, কেউ অধাতু আবার কেউবা ধাতুকল্প। আমরা এক নজরে ধাতু অধাতুর পরিচয় নিয়ে নিতে পারি।

সারণি - 5 ধাতু এবং অধাতুর বৈশিষ্ট্য

ধাতু	অধাতু
1. সাধারণ অবস্থায় কঠিন, ব্যতিক্রম— মারকারি, মারকারি তরল।	1. কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় হতে পারে।
2. নিজস্ব দ্যুতি আছে, আলোক প্রতিফলনে সক্ষম, ধাতব শব্দের মাধ্যমে আঘাতের প্রতিবাদ জানায়।	2. দ্যুতিহীন, আলোক প্রতিফলনে অক্ষম। ব্যতিক্রম— আয়োডিন ও 'গ্রাফাইটের' দ্যুতি আছে। 'হীরক' আলোক প্রতিফলন করে। আঘাতে প্রতিবাদ বিমুখ।
3. সাধারণত ভারী, ব্যতিক্রম— সোডিয়াম, পটাশিয়াম জল অপেক্ষা হালকা।	3. সাধারণত হালকা, ব্যতিক্রম— আয়োডিনের ঘনত্ব উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি।
4. তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী, মারকারির তাপ ও তড়িৎ পরিবহনের ক্ষমতা কম।	4. তাপ ও তড়িৎ পরিবহনে অক্ষম।

5. শক্ত এবং দৃঢ়। প্রসার্যতা (ductility) এবং অধিকতর ঘাতসহতা (malleability) ধর্মের অধিকারী। এদের খুব সরু তার ও পাতলা পাতে পরিণত করা যায়।	ব্যতিক্রম— 'গ্রাফাইট' ও 'গ্যাস কার্বন' তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী।
6. সাধারণত উচ্চ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট।	5. প্রসার্যতা ও ঘাতসহতা ধর্ম দেখায় না।
7. বাষ্পীয় অবস্থায় অণু এক - পরমাণুক।	6. সাধারণত নিম্ন গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট, তবে কার্বন, বোরন, সিলিকন উচ্চ গলনাংক বিশিষ্ট।
8. 'আয়ন বিভব' (Ionization potential) কম।	7. সাধারণত একাধিক পরমাণু নিয়ে অণু গঠিত যেমন— H_2, O_2, N_2, P_4, S_8 ইত্যাদি।
9. তড়িৎ ধনাত্মক।	8. 'আয়ন বিভব' বেশি।
10. সাধারণত ক্ষারীয় অক্সাইড তৈরি করে।	9. তড়িৎ ঋণাত্মক।
	10. আম্লিক অক্সাইড তৈরি করে।

ধাতুকল্প মৌলগুলি যেমন আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, সিলিকন, জার্মেনিয়াম প্রভৃতি কতকটা ধাতব এবং কতকটা অধাতব গুণাবলীর অধিকারী।

আমাদের বহুরূপ ধারণের দক্ষতার কথা না জানলে আমাদের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় পর্বটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রূপ-রং বদলের খেলায় তোমরাও কম যাও না! শুনতে পাই খেলার মাঠ আর রাজনীতির মঞ্চই তোমাদের রূপ-রং বদলের বড়ো আসর। আমাদের রূপ-রং বদলের ধর্মকে রসায়নবিদরা নাম দিয়েছেন Allotropy অর্থাৎ বহুরূপতা; গ্রিক 'allos' মানে 'অন্য' আর 'tropos' মানে 'রূপ'। কোনো মৌলের ভিন্ন ভৌত ধর্ম বিশিষ্ট এবং কিছু কিছু ভিন্ন রাসায়নিক ধর্ম বিশিষ্ট একাধিক রূপে প্রকাশ ধর্মকে বলা হয় বহুরূপতা আর বিভিন্ন রূপগুলিকে বলা হয় মৌলটির বহুরূপ বা রূপভেদ (Allotrope)। আমাদের বহুরূপতার জন্য দায়ী আমাদের রূপভেদের কেলাসন শৈলীর পার্থক্য, অণুতে পরমাণু সংখ্যার তারতম্য এবং আভ্যন্তরীণ শক্তির পার্থক্য। দেখা গেছে যে বহুরূপতা প্রদর্শনে অধাতুরা ধাতুর থেকে এগিয়ে কারণ অধিকাংশ ধাতু নির্দিষ্ট কেলাসাকার রূপে থাকতে পছন্দ করে। কিছু কিছু ধাতু যেমন আয়রন, টিন বহুরূপতা প্রদর্শন করে যদিও অধাতু যেমন কার্বন, সালফার, ফসফরাস, অক্সিজেন প্রভৃতি বহুরূপ ধারণে অধিক দক্ষ।

মানবজাতির জানা প্রাচীনতম রাসায়নিক মৌল হল কার্বন। এর সঙ্গে প্রথম কখন তোমাদের পূর্বপুরুষদের পরিচয় ঘটেছিল তা বলা যায় না। তবে আগুনের ব্যবহার শেখার অনেক

আগেই বজ্রাঘাতে পোড়া কাঠের মাধ্যমে কার্বনের সঙ্গে মানুষের সাক্ষাৎ ঘটে। তখন মৌল ভাবনার বিকাশ ঘটে নি। 1789 সালে প্রকাশিত এবং ল্যাভয়সিয়ের কর্তৃক সংকলিত "সরল পদার্থের তালিকায়" "সরল পদার্থ" হিসেবে কার্বনের উল্লেখ আছে। 'গ্রাফাইট' এবং 'হীরকের' ব্যবহার মানুষ বহুপূর্ব থেকেই জানত যদিও এরা ভিন্ন পদার্থ হিসেবে গণ্য হত।

বহুরূপী কার্বন রং বদলের খেলায় খুবই পটু। সে হীরকের বেশ ধরে কখনওবা রাজা বাদশা ও বিত্তবানদের দেহশোভা বৃদ্ধি করছে আবার কখনওবা ভূত্বকের ঘোমটা পরে সকলের দৃষ্টি বাঁচিয়ে চলতেই সে সচেষ্ট। বুঝতে পারছ — কয়লার কথা বলছি। বিজ্ঞানীদের কাছে ঘোমটা টিকল না। তোমাদের সমাজেও তো আজকাল ঘোমটা অর্থাৎ রেখে ঢেকে চলাটা খুব একটা পছন্দ নয়। যাক্‌গে, বিজ্ঞানীরা কালো কয়লাতেই অরূপরতন খুঁজে পেলেন আর সোহাগ করে তার নাম দিলেন "Black Diamond" অর্থাৎ কালোহীরা। কারণ কয়লা শুধু জ্বালানির কাজই করে না। বিজ্ঞানীরা এর থেকে বের করে আনলেন কোল গ্যাস, অ্যামোনিয়াকেল লিকার, আলকাতরা এবং কোক। আলকাতরা থেকে এখন তৈরি হচ্ছে সুগন্ধজাতীয় দ্রব্য, রঞ্জক সামগ্রী, ওষুধ, কীটপতঙ্গ প্রতিষেধক, বিস্ফোরক পদার্থ, প্লাস্টিক, টেরেলিন ইত্যাদি। কখনো কার্বন রূপ নেয় গ্রাফাইটের, কখনো বা সে চারকোল, আবার কখনো সে গ্যাস কার্বন। তোমরা যেমন গান কর —

> "শিং নাই তবু নাম তার সিংহ,
> ডিম নয় তবু অশ্বডিম্ব"

তেমনি গ্যাস নয় — অনেকটা বিশুদ্ধ কঠিন কার্বন কণা — তবু নাম তার গ্যাস কার্বন।

হীরক ও গ্রাফাইট কেলাসাকার। অঙ্গার, ভুসাকালি, কোক, গ্যাস কার্বন প্রভৃতি হচ্ছে কার্বনের অনিয়তাকার রূপভেদ। পরমাণুর পারস্পরিক সমযোজ্যতার বাঁধনে আবদ্ধ কার্বন তৈরি করে চতুস্তলকীয় একক আর অসংখ্য ঐ এককের ত্রিমাত্রিক সংযোজনে গঠিত হয় হীরকের ঘনাকার সুদৃঢ় কেলাস (চিত্র-5)। এ গঠন বৈশিষ্ট্যই হীরকের কাঠিন্য, উচ্চ গলনাঙ্ক ও রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তার জন্য দায়ী। গ্রাফাইটরূপী

চিত্র - 5 : হীরকের গঠন
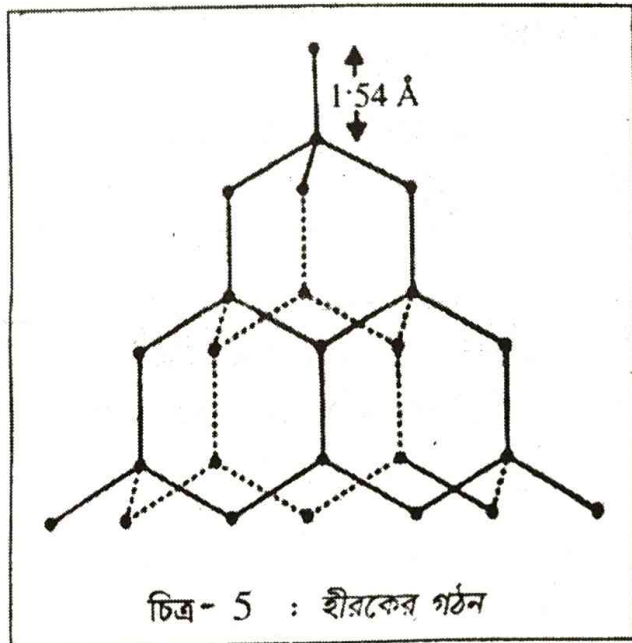
কার্বনের ষড়ভুজাকার কেলাস স্তরে স্তরে শিথিল বাঁধনে সজ্জিত (চিত্র-6)। তাই এটি নরম।

চিত্র – 6 : *গ্রাফাইটের গঠন*
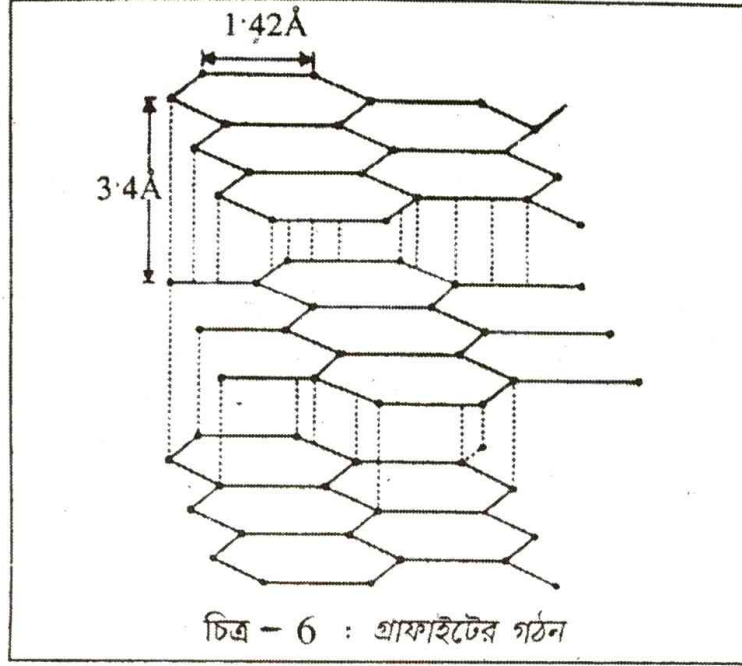
1985 সালে কার্বনের নবরূপের আবির্ভাব ঘটল মহাসমারোহে। ষাট কার্বন পরমাণু সমন্বিত কার্বন অণুর (C_{60}) অস্তিত্বের ঘোষণা প্রকাশিত হল বিজ্ঞান জগতের কুলীন পত্রিকা 'ন্যাচার' (Nature)-এ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড-ই স্মলি এবং তাঁর সহকর্মিগণ 1985 সালে গ্রাফাইটের উপর লেজার রশ্মি প্রয়োগ করে খুব শক্ত পদার্থ পান, ভর বিশ্লেষক যন্ত্রে যা ষাট কার্বন পরমাণু নিয়ে গঠিত কার্বন অণু C_{60} হিসেবে ধরা দেয়। এর ব্যাস 1 মিলিমিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ কার্বনের এই রূপভেদটি ন্যানো কণা (Nano particle) হিসেবে গণ্য হয়। পদার্থবিদ ও গণিতজ্ঞরা অঙ্ক কষে বললেন যে 12টি পঞ্চভুজ এবং 20টি ষড়ভুজের সমন্বয়ে গঠিত হবে C_{60} রূপভেদটি (চিত্র-7)। বিখ্যাত মার্কিন স্থপতি বাকমিনিস্টার ফুলারের (Buckminister Fuller) স্থাপত্যের অণুকরণে গড়া হল C_{60}-র চিত্র যা অনেকটা ফুটবলের মত। স্মলি ও তাঁর সহযোগীরা বাকমিনিস্টার ফুলারের নাম অনুসারে C_{60} এবং তার সমগোত্রীয় কার্বন অণুর নাম দিলেন

চিত্র – 7 : *ফুলারিনের গঠন*
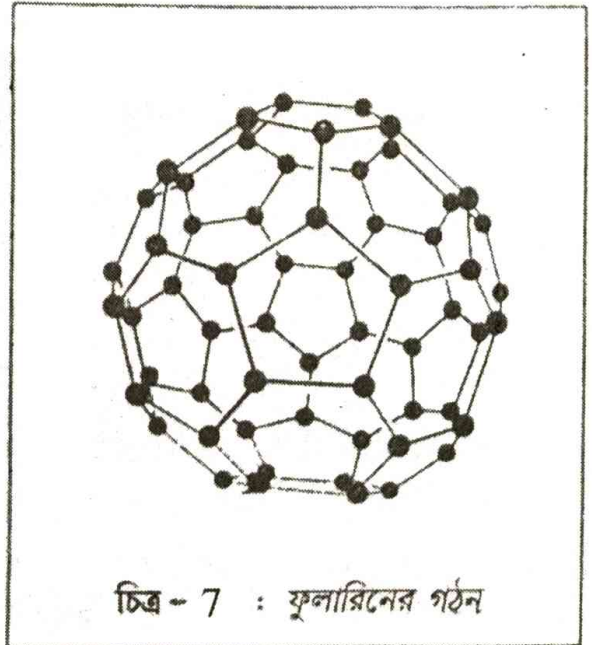
ফুলারিন (Fullerene) আর আকৃতি যেহেতু বলের মতো তাই আরেকটি নাম হল বাকি বল (Bucky ball)। ফুলারিন কিন্তু ফুলের মতো মোটেই কোমল নয় বরং কঠিনতম পদার্থ। ফুলারিন গোষ্ঠীর অন্য সদস্যরা হল C_{28}, C_{32}, C_{50}, C_{70}, C_{84}, C_{90} এমনকী C_{540}। পাথুরে মাটি পরীক্ষা করেও C_{60}র সন্ধান মিলেছে। প্রকৃতির কোলেও C_{60}-র অস্তিত্বের খবরে বিজ্ঞানীরা উৎসাহিত। তোমাদের বলে রাখি ফুলারিন কার্বন-রসায়নে এক বিরাট নূতন দিগন্ত খুলে দিতে যাচ্ছে।

92টি প্রাকৃতিক মৌলের মধ্যে কার্বন একটি। এর মহিমা অপার। গুণ ও কাজের বিচারে কার্বন অদ্বিতীয়। বস্তুত কার্বনের ভূমিকা এতই ব্যাপক যে কার্বনকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে রসায়ন শাস্ত্রের একটি প্রধান শাখা— জৈব রসায়ন (Organic Chemistry)। ল্যাটিন শব্দ 'কার্বো' (Carbo) মানে কয়লা থেকে কার্বন (Carbon) নামটি এসেছে। কার্বনের রাসায়নিক চিহ্ন C, পারমাণবিক সংখ্যা 6।

প্রকৃতিতে কার্বন মুক্ত এবং যুক্ত উভয় অবস্থাতেই পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ মৌল অবস্থায় কার্বন হীরক রূপে অবস্থান করে। যুক্ত অবস্থায় কার্বন জীব দেহের সঙ্গে এবং জীবন ধারণের বিভিন্ন উপকরণ— যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প প্রভৃতির সঙ্গে খুবই নিবিড়ভাবে বর্তমান। কার্বনের প্রধান দুটি সমস্থানিক হল C^{12} (প্রায় 98.89%) এবং C^{13} (প্রায় 1.19%)। বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে অতি অল্প পরিমাণে তেজস্ক্রিয় কার্বন সমস্থানিক C^{14} পাওয়া যায়।

মানব সমাজে বহু পূর্ব থেকেই সালফার (Sulphur, গন্ধক) ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রাচীন গ্রিসে, হোমারের সময়ে সালফার পুড়িয়ে উৎপন্ন গ্যাসের সাহায্যে ঘরদোর বীজাণুমুক্ত করা হত। সালফার প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় বিরাজ করে। আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে তোমরা এর প্রাচুর্য লক্ষ্য করবে। আবার আকরিকের প্রধানত ধাতব সালফাইড এবং সালফেটের রূপ ধরেও সালফার ধরিত্রীর গর্ভে বিদ্যমান। 1808 সালে এইচ ডেভি (H. Davy) বলেন যে সাধারণ অবস্থায় সালফারের সঙ্গে অল্প পরিমাণে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন যুক্ত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ সালফারের মৌলিকত্ব নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। 1909 সালে গে-লুসাক (Gay Lussac) সংশয়ের ঊর্ধ্বে প্রমাণ করেন যে সালফার একটি মৌল। সালফার নামকরণের উৎসটি স্পষ্ট নয়।

সালফারও একটি বহুরূপী মৌল। রম্বিক সালফার, প্রিজম সালফার ও নেক্রিয়াস সালফার এর কঠিন নিয়তাকার রূপভেদ। অনিয়তাকার রূপভেদগুলি হল প্লাস্টিক সালফার, শ্বেত সালফার ও কোলয়ডীয় সালফার। রূপভেদসমূহের মধ্যে রম্বিক সালফার সর্বাপেক্ষা সুস্থিত। অন্যান্য রূপভেদগুলি সাধারণ উষ্ণতায় ধীরে ধীরে রম্বিক সালফারে রূপান্তরিত হয়। রম্বিক সালফারের কেলাসে আটটি পৃষ্ঠতল আছে তাই একে অষ্টপলা (Octahedral) সালফারও

চিত্র — ৪ : রম্বিক সালফার

বলা হয়। রম্বিক সালফারে ৪টি সালফার পরমাণু সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আঁকাবাঁকা অষ্টকোণী বলয় (Eight membered puckered ring) গঠন করে (চিত্র-৪)। তাপ প্রয়োগের ফলে সালফারের বলয় গঠনটি ভেঙে যায় এবং লম্বা শৃঙ্খলাকার অণুতে পরিবর্তিত হয়। আরও অধিক উষ্ণতায় শৃঙ্খল ভেঙে ছোটো ছোটো অণুতে (যেমন S_6, S_4, S_2) পরিণত হয়।
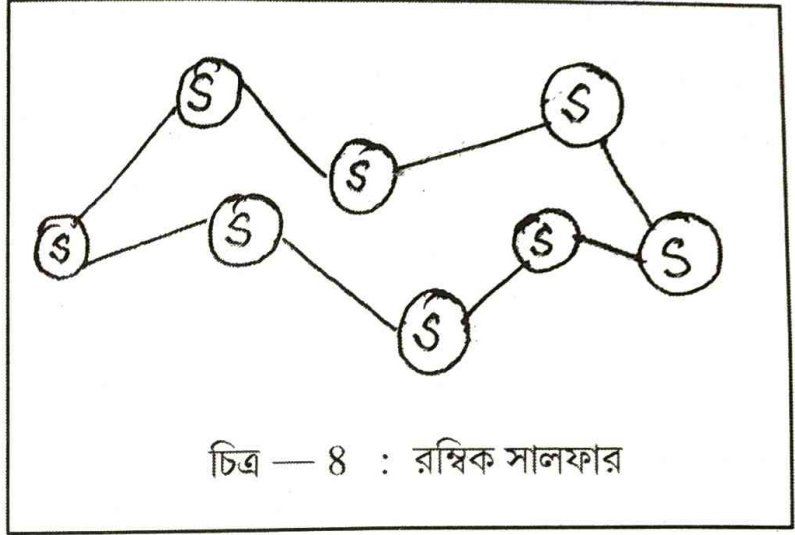
৪টি পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত S_8 অণু উচ্চ আণবিক গুরুত্ব সম্পন্ন হওয়ার সুবাদে সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন অথচ "একই পরিবারভুক্ত" অক্সিজেন গ্যাসীয় কারণ অক্সিজেন দ্বি-পরমাণুক (O_2)। সালফার অণুতে আন্তঃপারমাণবিক আকর্ষণ বল অক্সিজেন অণুর তুলনায় বেশি।

সালফারের রাসায়নিক চিহ্ন S, পারমাণবিক সংখ্যা 16।

স্মরণাতীত কাল থেকেই মানুষ সোনা, রূপা, তামা, লোহা, টিন, সিসা, পারদ এই সাতটি ধাতব মৌলের ব্যবহার করে আসছে এবং মানব সভ্যতার বিকাশে ঐ ধাতুগুলি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। আগুনের ব্যবহার আর পাথরের ব্যবহারের মাধ্যমেই মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটে বলা যায়। কালের গতিতে প্রস্তর যুগকে পেছনে ফেলে এল তাম্র যুগ— ব্রোঞ্জ যুগ— লৌহ যুগ।

সোনা প্রকৃতিতে প্রধানত মুক্ত অবস্থায় বর্তমান; আকরিক রূপেও ভূগর্ভে বিরাজ করে। সোনার ঔজ্জ্বল্য মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। অপরিবর্তনশীল চেহারা, সহজে বণ্টনযোগ্য এবং মহার্ঘ গুণাবলীর জন্য টাকার বিকল্প হিসেবে সোনা মর্যাদা অর্জন করেছিল। এখনও কোনো দেশের আর্থিক অবস্থা তার সঞ্চিত স্বর্ণ ভাণ্ডারের নিরিখে যাচাই করা হয়। মিশরে পিরামিড খনন করে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ প্রচুর পরিমাণ সোনার অলংকার পেয়েছিলেন। খ্রিষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে চীন, ভারত, মেসোপটেমিয়ায় সোনার ব্যবহার ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে গ্রিসদেশে সোনার মুদ্রার ব্যবহার ছিল। আর্মেনিয়াতে সোনার টাকা দেখা গিয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে। ভারতে ও আফ্রিকায় প্রাচীনতম সোনার খনি বর্তমান। সোনার পারমাণবিক সংখ্যা 79.

মূল্যবান সোনার অধিকার বজায় রাখতে মানুষকেও অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল— দিতে হচ্ছে। সোনার অধিকার নিতে দেশে দেশে প্রাণঘাতী সংঘর্ষ হয়েছে — বীভৎস অপরাধ সংঘটিতও হয়েছে— হচ্ছে। সোনা পেয়ে কি মানুষ সুখী হতে পেরেছে — শান্তি পেয়েছে! সোনা হারাবার ভয়ই যেন মানুষকে বরাবর তাড়া করেছে — করছে। শুনতে পাই আজকাল তোমাদের সমাজে সোনার অলংকার ব্যাংকের নিরাপদ জিম্মায় রেখে (অবশ্যই বেশ খানিকটা দক্ষিণার বিনিময়ে) নকল সোনা ব্যবহারের প্রচলন হয়েছে।

রূপা সোনার চেয়ে বেশি সক্রিয় এবং প্রকৃতিতে প্রাচুর্যের নিরিখে সোনার প্রায় পনেরো গুণ। প্রাচুর্যে এগিয়ে থেকেও প্রথম অবস্থায় রূপার দাম সোনার চেয়ে বেশি ছিল। রূপা মুক্ত অবস্থায় কদাচিত বিরাজ করে এবং মূলত আকরিক রূপে প্রকৃতিতে বর্তমান। রূপার প্রধান আকরিক হল আর্জেনটাইট (Argentite, Ag_2S), সিলভার-কপার গ্ল্যান্স (Silver-copper glance, Ag_2S, Cu_2S), হর্ন সিলভার (Horn Silver, AgCl)। মুদ্রা এবং অলংকার তৈরী ছাড়াও রূপা বাসন পত্তর জল পাত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হত। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের কথা। আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেছেন। গ্রিক সৈন্যরা এখানে এক মারাত্মক আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হয় এবং বাড়ি ফিরে যাবার দাবি করে। অদ্ভুত ব্যাপার হল যে একই সেনা-ছাউনিতে কাটিয়েও গ্রিক সেনাপতিরা এই রোগে কম আক্রান্ত হলেন। প্রায় দুহাজার বছর অতিক্রান্ত হবার পর বিজ্ঞানিগণ এর একটা কারণ খুঁজে পেয়েছেন। সেনাপতিগণ রূপার পাত্রে পানীয় গ্রহণ করতেন আর সৈন্যরা টিনের কাপে। সম্ভবত রূপা স্বল্পমাত্রায় পানীয়তে দ্রবীভূত হয়ে কোলয়ডীয় দ্রবণ তৈরি করে যা ক্ষতিকারক বীজাণু ধ্বংস করে। রূপার পারমাণবিক সংখ্যা 47.

রাসায়নিক সক্রিয়তা কম হওয়ায় তামা খুব অল্প পরিমাণে মুক্ত অবস্থায় এবং মূলত খনিজের আকারে প্রকৃতিতে বর্তমান। তামার প্রধান আকরিক হল কপার পাইরাইটস (Copper pyrites, Cu_2S, Fe_2S_3), কপার গ্লান্স (Copper glance, Cu_2S), অ্যাজুরাইট (Azurite, $2CuCO_3 Cu(OH)_2$), কিউপ্রাইট (Cuprite, Cu_2O)। ফ্রান্সের রসায়নবিদ এম. বারথেলট (M. Berthelot) এর মতে পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি আগে থেকেই তামার সঙ্গে মানুষের পরিচয় ছিল। তামা ও টিনের ধাতু সংকর ব্রোঞ্জ এবং তামা ও দস্তার (Zinc) ধাতু সংকর পিতলের ব্যবহার তোমাদের পূর্বপুরুষেরা বহু আগে থেকেই জানতেন। অলংকার, বিভিন্ন সৌখিন জিনিস, মূর্তি, ছুরি, তীরের ফলা, ঢাল, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি তৈরিতে ব্রোঞ্জ ব্যবহার করা হত। বাসন-পত্তর তৈরিতে ব্যবহৃত হত পিতল। কপারের পারমাণবিক সংখ্যা 29.

ধাতুগুলির মধ্যে প্রাচুর্যের নিরিখে প্রকৃতিতে অ্যালুমিনিয়ামের পর দ্বিতীয় স্থানে আছে লোহা।

রাসায়নিক সক্রিয়তার কারণে লোহাকে প্রকৃতিতে কখনও মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। অক্সাইড, কার্বোনেট ও সালফাইড রূপে লোহা ভূগর্ভে বিভিন্ন খনিজে বর্তমান। তোমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে লোহার প্রথম পরিচয়ের উৎস ছিল সম্ভবত উল্কা। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষ লোহা ব্যবহারে হাত লাগায়। প্রথম অবস্থায় লোহা ছিল খুবই দামি। এমনকী সোনার চেয়েও।

খ্রিষ্টপূর্ব দুহাজার বছর আগে মিশরেও মেসোপটেমিয়ায় আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশন করা হত — গ্রিসে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষে, ভারতবর্ষে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্যভাগে এবং চীনে খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যভাগে আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশন করা হত। লোহা নিষ্কাশনে এবং প্রয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় ধাতুবিদগণ প্রভূত সাফল্য লাভ করেছিলেন। দেড় হাজার বছরেরও আগের লৌহ নির্মিত কুতুবমিনারের অক্ষত ও অবিকৃত চেহারা এই সাক্ষ্যই বহন করে।

ক্রমশ লোহা নিষ্কাশন শৈলীর সরলীকরণে লোহার উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং ফলত এর দাম কমে। বলা হয় খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে লৌহযুগের সূচনা হয়। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে লোহা প্রবেশ করে।

বিশুদ্ধ লোহার তিনটি রূপভেদ হল — আলফা-আয়রন ($\alpha -$ iron), গামা-আয়রন ($\gamma -$ iron), এবং ডেলটা-আয়রন ($\delta -$ iron),

$$\alpha\text{ - iron} \underset{}{\overset{912^{\circ}C}{\rightleftharpoons}} \gamma\text{ - iron} \overset{1400^{\circ}C}{\rightleftharpoons} \delta\text{ - iron}$$
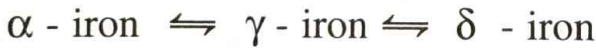
লোহার পারমাণবিক সংখ্যা 26

প্রকৃতিতে মুক্ত সিসার সাক্ষাৎ কদাচিৎ ঘটে, তবে আকরিক থেকে মোটামুটি সহজ উপায়ে সিসা নিষ্কাশন করা যায়। সিসার প্রধান আকরিক গ্যালেনা (galena,PbS)। মিশরীয়রা লোহা ও রূপার সঙ্গে পরিচয় পেয়েছিল সিসার। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে ভারত ও চীনে সিসা উৎপাদিত হয়। গ্রিকরা স্পেনে অনেক সিসার খনি খনন করেছিল যা পরে রোমানরা অধিকার করে নেয়। প্রাচীন রোমে প্রচুর পরিমাণে সিসা ব্যবহৃত হত — বাসনপত্তর, পান-পাত্র, শলাকা, ভূগর্ভস্থ জলবাহী নল ইত্যাদি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হত সিসা। রোম সাম্রাজ্যে সিসা বৈভবের সূচক হিসেবে গণ্য হত। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে সিসা মানুষের দেহে প্রবেশ করে নানা প্রকার মানসিক ও স্নায়বিক বৈকল্যের কারণ ঘটায়— এমনকী মৃত্যুর কারণ হতে পারে। গবেষকরা মনে করেন যে সিসার অত্যধিক ব্যবহার রোমবাসীদের হীনবীর্য করে তোলে

আর সিসা-দূষণই রোম সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়। সিসা মুদ্রণ শিল্পে, পেইন্ট তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পেট্রোলের মানোন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত সিসার একটি যৌগ টেট্রাইথাইল লেড (Tetraethyl Lead) বায়ুদূষণ ঘটায়। তাই আজকাল সিসাহীন জ্বালানি তেল (Deleaded Petrol) ব্যবহারের কথা বলা হচ্ছে। সিসার পারমাণবিক সংখ্যা 82 ।

প্রকৃতিতে কদাচিত মুক্ত অবস্থায় টিনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। টিন মূলত ক্যাসিটেরাইট (Cassiterite) অর্থাৎ অক্সাইড আকরিকের (SnO_2) রূপ ধরে প্রকৃতিতে বিরাজ করে। প্রায় 6.5 হাজার বছর আগে টিনের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটে। প্রাচীনকালে ভূমধ্য সাগরীয় দেশগুলি, পারস্য ও ভারত টিনের ব্যবহার জানত। ব্রোঞ্জ তৈরি করার জন্য মিশরীয়গণ পারস্য থেকে টিন আমদানি করত। ব্রোঞ্জের প্রস্তুতি ছাড়াও টিন অলংকার ও বাসনপত্তর তৈরিতে ব্যবহৃত হত।

টিনের তিনটি নিয়তাকার রূপভেদগুলি হল — ধূসর আলফা-টিন ($\alpha - tin$), সাদা বিটা-টিন ($\beta - tin$), এবং গামা-টিন ($\gamma - tin$),

$$\alpha\text{ - tin} \overset{13.2^{\circ}C}{\rightleftharpoons} \beta\text{ - tin} \overset{161^{\circ}C}{\rightleftharpoons} \gamma\text{ - tin}$$
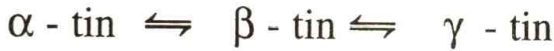
আলফা-টিনের গঠন হীরকের মতো, বিটাও গামা-টিনের গঠন ঘন সন্নিবিষ্ট ধাতব কেলাসাকার। টিনের “প্লেগ” রোগের কথা কি তোমরা শুনেছ! তাপমাত্রা 13.2° সেন্টিগ্রেডের নীচে গেলে সাদা টিন ধূসর বর্ণ ধারণ করে, টিনের আকার বৃদ্ধি ঘটে এবং ভাঙন দেখা দেয়। ভাঙন প্রকট রূপ ধারণ করে — 60°C তাপমাত্রায়। দেখা যায় যে অত্যধিক শীতে টিনের আসবাবপত্র চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পাউডারে পরিণত হয়। এ অবস্থাকে টিনের প্লেগ রোগের (Tin plague) ফলশ্রুতি হিসেবে গণ্য করা হয়। টিনের পারমাণবিক সংখ্যা 50 ।

পারদ প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। স্পেইনের পার্বত্যাঞ্চলের কুয়োর তলায় মুক্ত অবস্থায় পারদ পাওয়া গিয়েছিল। পারদের প্রধান আকরিক কিন্নাবার (Cinnabar HgS)। প্রাচীন ভারত ও চীন পারদের ব্যবহার জানত। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মিশরীয় সমাধিগুলি খনন করে পারদের হদিশ পাওয়া গিয়েছিল।

রুশ বিজ্ঞানী ই. এফরেমোভ রচিত কল্পকাহিনী "The Lake of the Mountain Spirit"-এ তোমরা পারদের উল্লেখ পাবে। পর্বতশীর্ষে অবস্থিত একটি হ্রদে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে মানুষ বেড়াতে গেলে আর ফিরে আসতে পারত না। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা মনে করত যে হ্রদে মন্দ প্রেতাত্মারা বাস করত আর ভ্রমণকারীদের মেরে ফেলত। গবেষকরা পরীক্ষা নিরীক্ষা

করে দেখতে পান যে হ্রদের জলে মুক্ত পারদ যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। পারদপূর্ণ হ্রদ থেকে উত্তপ্ত আবহাওয়ায় পারদ বাষ্প ওঠে যা অত্যন্ত বিষাক্ত। বিষাক্ত পারদ বাষ্পই, তথাকথিত মন্দ প্রেতাত্মার নামে, ভ্রমণকারীদের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

প্রাচীনকালে পারদের সংকর ধাতু দিয়ে আয়না তৈরি করা হত। পারদ ও পারদ যৌগ ওষুধ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হত। ভারতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সঙ্গে রসায়ন শাস্ত্রের অনুশীলন শুরু হয়। তরল ধাতু পারদকে বলা হত "সর্ব রোগ হরা"; একেই কি বলে 'বিষে বিষক্ষয়' ? কারণ পারদ নিজেই তো বিষ! পারদের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হল 'রস', আর বলা হয় তার থেকেই এসেছে "রসায়ন"।

তরল ও রূপার মতো সাদা হবার সুবাদে পারদের নাম হয়েছিল "ক্যুইক সিলভার" (Quick Silver)। সাধারণ তাপমাত্রায় পারদ সর্বাপেক্ষা ভারী তরল পদার্থ। পারদের পারমাণবিক সংখ্যা 80 ।

অ্যান্টিমনি মৌলের সঙ্গে মানুষের পরিচয় দীর্ঘদিনের, যদিও প্রাচুর্যের নিরিখে এর অবস্থান খুব উপরে নয়। প্রাচীনকালে অ্যান্টিমনি প্রধানত প্রসাধনী বস্তু রুজ এবং চোখের ভ্রূ কালো করতে কালো রং হিসেবে ব্যবহৃত হত। গবেষকরা মনে করেন 3400 খ্রিষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ ব্যাবিলনে অ্যান্টিমনির পাত্র ব্যবহার করা হত। অ্যান্টিমনির প্রধান আকরিক স্টিবনাইট (Stibnite, Sb_2S_3)। অ্যান্টিমনি অন্যান্য মৌলের আকরিকের সঙ্গে মিশে থাকে, বলা হয় সে একা থাকতে ভয় পায়। তাই তার নাম গ্রিক শব্দ "অ্যান্টিমনাস" (Antimonos), মানে 'একাকিত্বের শত্রু' (An enemy of solitude), থেকে এসেছে। এর রাসায়নিক চিহ্ন Sb, তার ল্যাটিন নাম 'স্টিবিয়াম'(Stibium) থেকে হয়েছে। অ্যান্টিমনির পারমাণবিক সংখ্যা 51 ।

ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত আমাদের যে সকল সদস্যদের সঙ্গে তোমাদের পূর্বপুরুষদের পরিচয় ঘটেছিল তারা হল কার্বন, সালফার, গোল্ড, সিলভার, কপার, টিন, আয়রন, লেড, মারকারি ও অ্যান্টিমনি।

আমাদের অন্যান্য সদস্যরাও ক্রমশ বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা দিতে লাগল। আলো ফুটিয়ে একটি মৌল আত্মপ্রকাশের জানান দিল, তার নাম ফসফরাস। খুব সক্রিয় তাই মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে এর দেখা মেলে নি। প্রধানত ফসফেট লবণ রূপেই প্রকৃতিতে সে অবস্থান করে। প্রাচুর্যের নিরিখে ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণু সংখ্যার প্রায় 0.04 শতাংশ হচ্ছে ফসফরাস।

1669 সাল, জার্মান কিমিয়াবিদ হেনিং ব্র্যান্ড (Hening Brand) মানুষের প্রস্রাব বাষ্পীভূত করে পাতনের মাধ্যমে একটি লাল তরল বস্তু পান। তিনি তার নাম দেন 'প্রস্রাবের তেল'

(Urine oil)। প্রস্রাবের তেল আবার পাতিত করে ব্র্যান্ড একটি কালো অবশেষ পান, যা ভস্মীকরণে সাদা অনুপ্রভা সৃষ্টিকারী পদার্থে পরিণত হয়। নিজে থেকেই আলো ফোটানোর সুবাদে পদার্থটির নাম হয়েছিল ফসফরাস। 1777 সালে সি. শিলে (C. Scheele) অস্থিচূর্ণ থেকে ফসফরাস তৈরি করেন।

ফসফরাসের প্রধান দুটি রূপভেদ হল— সাদা বা পীতাভ ফসফরাস (চিত্র-9) এবং লাল ফসফরাস (চিত্র - 10)। সাদা ফসফরাস অত্যন্ত বিষাক্ত এবং অতি সক্রিয়, বায়ুর অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলেই জারিত হয়ে সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি করে। তাই সাদা ফসফরাসকে জলের নীচে রাখা হয়। লাল ফসফরাস কম সক্রিয় এবং নিরাপদ।
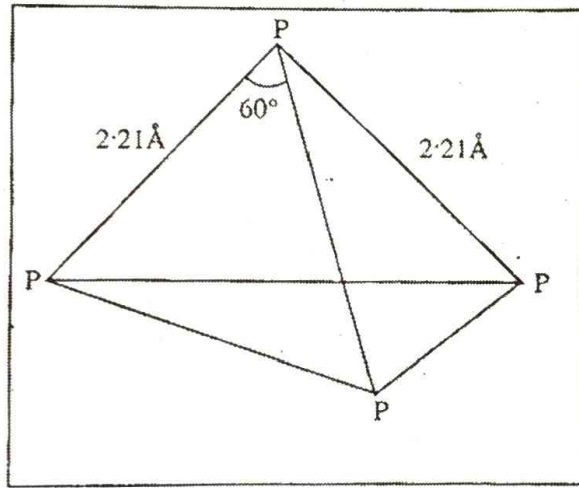
চিত্র 9 ঃ সাদা ফসফরাসের গঠন
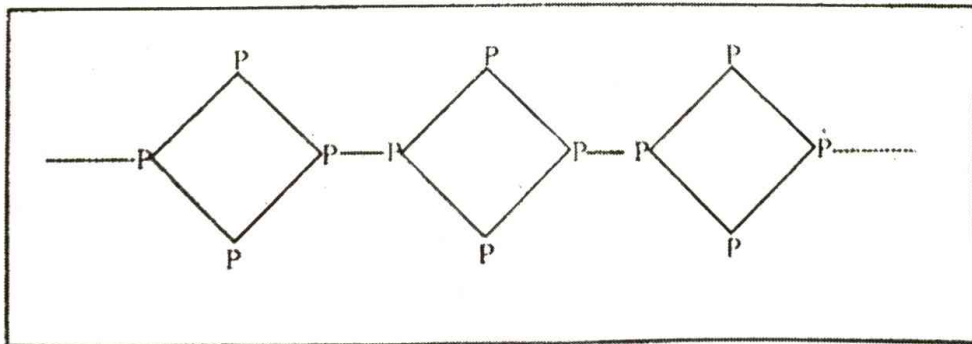
চিত্র 10 ঃ লাল ফসফরাসের গঠন

ফসফরাসের প্রতিটি অণু চারটি পরমাণু নিয়ে গঠিত, পরমাণু চারটি একটি বিকৃত চতুস্তলকের চারটি কৌণিক বিন্দুতে অবস্থান করে। পারস্পরিক আকর্ষণের ফলে ফসফরাস পরমাণুসমূহ সংযোজিত হয়ে নির্দিষ্ট জ্যামিতিক গঠন ও কঠিন আকার ধারণ করে। 'একই পরিবার ভুক্ত' নাইট্রোজেন অণু দ্বিপরমাণুক এবং গ্যাসীয়।

তোমরা কি জলের মধ্যে আগুন জ্বালাতে চাও! তাহলে একটি পরীক্ষা করে দেখতে পার। জলভর্তি একটি কাচের ফ্লাস্ক নাও। জলের নীচে এক টুকরো সাদা ফসফরাস এবং তার পাশে কিছু পটাশিয়াম ক্লোরেট রাখো। এবার একটি দীর্ঘনল ফানেলের সাহায্যে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড খুব সাবধানে এদের উপর ঢালো। জলের নীচেই স্ফুলিঙ্গ সহকারে ফসফরাসকে জ্বলতে দেখবে। কী মজা, তাই তো ! আমাদের দিকে মনোযোগ দিলেই তোমরা দেখতে পাবে আমরা কত মজাই না দেখাতে পারি। সাদা ফসফরাস 'শীতল-শিখা' তৈরির কেরামতিও দেখাতে পারে। ফসফরাসের পারমাণবিক সংখ্যা 15, রাসায়নিক চিহ্ন P।

আর্সেনিক কখনো কখনো প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। এটি প্রধানত অরপিমেন্ট (Orpiment, As_2S_3) এবং রিয়েলগার (Realgar, As_4S_4) খনিজে বর্তমান। গ্রিক ও রোমানদের সঙ্গে বহু আগে থেকেই আর্সেনিকের পরিচয় ছিল। বলা হয়, অ্যালবার্ট দি গ্রেট (Albert the Great) আর্সেনিক আবিষ্কার করেন। আর্সেনিক ও তার যৌগ অতি বিষাক্ত। ইঁদুর ও পোকামাকড় মারতে আর্সেনিক অক্সাইড বহুদিন ধরেই ব্যবহৃত হচ্ছে। আর্সেনিক বিষক্রিয়া মানুষেরও মৃত্যুর কারণ ঘটায়। মধ্যযুগে ইউরোপ ছাড়া এশিয়াতেও আর্সেনিক জানা ছিল। চীনের কিমিয়াবিদ্‌গণ খনিজ থেকে আর্সেনিক নিষ্কাশন করতে পারতেন। আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় মানুষের মৃত্যু ঘটলে চীনের কিমিয়াবিদগণই তা নিশ্চিত করে জানার বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গুপ্তবিদ্যা হিসেবে ব্যবহৃত তাঁদের বিশ্লেষণ পদ্ধতি অজ্ঞাতই থেকে যায়। পরবর্তী সময়ে ইউরোপে ডি. মার্শ (D. Marsh) আর্সেনিক বিষক্রিয়া নির্ণয়ের একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতি বের করেন যা এখনও ব্যবহৃত হয়।

বহুকাল আর্সেনিক ও এর অক্সাইড অভিন্ন বলে গণ্য হত। এইচ. ব্র্যান্ড ও ল্যাভয়সিয়ের আর্সেনিককে স্বতন্ত্র মৌলের মর্যাদা দেন। আর্সেনিকের তিনটি রূপভেদ হল ঃ আলফা-আর্সেনিক বা হলুদ আর্সেনিক, বিটা-আর্সেনিক বা কালো আর্সেনিক এবং গামা-আর্সেনিক বা ধূসর আর্সেনিক। ধূসর রূপটিই আর্সেনিকের সুস্থিত ও স্বাভাবিক রূপ।

বিসমাথ (Bismuth) প্রকৃতিতে মুক্ত ও যুক্ত অবস্থায় (Bi_2O_3, Bi_2S_3) বর্তমান। বহু দিন ধরে বিসমাথ মানুষের জানা ছিল যদিও এটিকে অ্যান্টিমনি, লেড এবং টিনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হত। বিসমাথ অল্প গলনাঙ্ক বিশিষ্ট সংকর ধাতুর একটি উপাদান। এর ধাতুসংকর বিদ্যুৎ ফিউজ তার, আগুন সংকেতের তার, বিস্ফোরক নিবারক প্লাগে ব্যবহৃত হয়। ই. ভন. লিপ্‌ম্যান (E. von Lippmann) তাঁর লেখা "History of Bismuth from 1480 to 1800" বই-এ ইউরোপে প্রচলিত বিসমাথের একুশটি নামের উল্লেখ করেন। অন্য কোনো মৌলের ক্ষেত্রে এত নাম জোটে নি। স্বতন্ত্র মৌলের মর্যাদা পেতে বিসমাথকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বিসমাথের পারমাণবিক সংখ্যা 83, রাসায়নিক চিহ্ন Bi।

জিংক (Zinc) মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। এর প্রধান আকরিক জিংক ব্লেন্ড (Zinc blende, ZnS) ও ক্যালামাইন (Calamine, $ZnCO_3$)। সুদূর অতীত থেকেই জিংকের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ছিল। ক্যালামাইন ভস্মীকরণে জাত পদার্থ চোখের উপসর্গ প্রশমনে ব্যবহৃত হত। আকরিক থেকে মুক্ত অবস্থায় আত্মপ্রকাশের আগেই জিংক আকরিক কপারের সঙ্গে পেতল প্রস্তুতিতে লেগে পড়ে। গ্রিক, রোম, ভারত ও চীনে পেতলের ব্যবহার জানা ছিল। পেতল বাসনপত্তর তৈরিতে ব্যবহৃত হত। বলা হয়, জিংক নামটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Zinc' থেকে, যার মানে সাদা। কেউ কেউ বলেন যে, জিংক নামটা জার্মান শব্দ 'Zink', মানে সীসা, উদ্ভূত। জিংকের পারমাণবিক সংখ্যা 30, রাসায়নিক চিহ্ন Zn।

(জল ও বায়ু দীর্ঘদিন মৌল হিসেবে গণ্য হয়ে আসছিল। এখন তোমরা জান যে, বায়ু মৌল নয়, একাধিক গ্যাসীয় মৌল ও যৌগের মিশ্রণ। ক্রমশ বায়ুর উপাদানগুলি একে একে বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা দিল। জানা গেল জলও মৌল নয়— যৌগ।)

সুদূর অতীত থেকে মানুষ কেবল একই ধরনের গ্যাসের সঙ্গে পরিচিত ছিল, তা হল বাতাস। বস্তুত বাতাস নিয়ে তখনকার দিনে পদার্থবিদরাই ভাবনা-চিন্তা করতেন, রসায়নবিদদের একে নিয়ে খুব একটা কৌতূহল ছিল না। গাঁজন, পচন প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থকে বিজ্ঞানিগণ তখন বাতাসের ভিন্ন রূপ বলেই মনে করতেন। বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী জে.ভ্যান. হেলমন্ট (J. van Helmont) সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'গ্যাসের' ধারণাটি উপস্থিত করেন। তিনি 62 পাউন্ড কাঠ পুড়িয়ে মাত্র 1 পাউন্ড ছাই পান। প্রশ্ন জাগে— বাকি অংশ কোথায় গেল ! হেলমন্ট মনে করেন যে, "কাষ্ঠ কোহলে" (Wood spirit) পরিণত হয়েছে, যাকে তিনি "গ্যাস' নাম দেন এবং বাতাসের একটি রূপ হিসেবেই গণ্য করেন। তোমরা বুঝতে পাচ্ছ গ্যাসটি ছিল কার্বন ডাই- অক্সাইড। হেলমন্ট গ্যাসটিকে চিনতে না পারলেও তাঁর 'গ্যাস' সংক্রান্ত ধারণা 'গ্যাস ভাবনাকে' রসায়নবিদদের অধ্যয়নের সীমানায় পৌঁছে দিয়েছিল।

আজকাল বিভিন্ন গ্যাস যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি রসায়নাগারে সহজেই প্রস্তুত করতে, সংগ্রহ করতে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গ্যাসগুলির ধর্মকর্ম প্রদর্শন করতে পারা যায়। তখনকার দিনে এমন ব্যবস্থা জানা ছিল না। গ্যাস অধ্যয়নের শুরুতে প্রাণিদেহের বিশেষ থলিগুলিই (যেমন মূত্রথলি) ছিল একমাত্র পরীক্ষাপাত্র যাতে গ্যাস সংগ্রহ করে ওজন করা হত।

1700 সাল নাগাদ জার্মান রসায়নবিদ জি. স্টহ্‌ল (G. Stahl) বস্তুর দহন ও জারণ সংক্রান্ত একটি তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন, যাকে বলা হয় "ফ্লোজিস্টন তত্ত্ব" (The Theory of Phlogiston)। গ্রিক শব্দ 'Phlogistos' মানে 'দাহ্য'। তখনকার দিনে 'ফ্লোজিস্টন তত্ত্ব'

রসায়নে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্টহ্‌ল বললেন যে, দহনক্ষম এবং জারণক্ষম পদার্থগুলিতে ‘‘ফ্লোজিস্টন’ নামক এক বিশেষ বস্তু বর্তমান যা দহন ও জারণ কালে নির্গত হয়। ধাতু, ধাতব অক্সাইড ও ফ্লোজিস্টনের যৌগ হিসেবে গণ্য হত। ফ্লোজিস্টিক তত্ত্ব অনুসারে ধাতুগুলি (ধাতু যৌগ ফ্লোজিস্টন) যৌগ পদার্থ এবং ধাতব ভস্মীকরণে (Calcination) উৎপন্ন মৃত্তিকা (earth) অর্থাৎ (ধাতু বিয়োগ ফ্লোজিস্টন)-কে মনে করা হত সরল পদার্থ। কয়লা গণ্য হত বিশুদ্ধ ফ্লোজিস্টন হিসেবে।

আধুনিক রসায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে দেখা যায় যে, ধাতুর জারণে উৎপন্ন ধাতব অক্সাইডের ওজন বৃদ্ধি পায় যা ফ্লোজিস্টিক তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ফ্লোজিস্টিক তত্ত্ব অনুসারে জারণ বা দহন প্রক্রিয়ায় ধাতু ফ্লোজিস্টন ত্যাগ করে। ওজন বৃদ্ধির ব্যাখ্যায় স্টহ্‌ল বলতে চাইলেন যে, ফ্লোজিস্টনের ওজন ঋণাত্মক তাই ফ্লোজিস্টন ত্যাগ ওজন বৃদ্ধির কারণ ঘটায়। ফ্লোজিস্টন তত্ত্বের প্রভাব এতই প্রবল ছিল যে, এইচ. ক্যাভেনডিশ (H. Cavendish), জে. প্রিস্টলে (J. Priestley) এবং সি. শিলের মতো তখনকার দিনের বিখ্যাত রসায়নবিদগণও এর বেড়াজাল ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারেন নি।

প্রাচুর্যের নিরিখে এগিয়ে থাকা মৌলদের অন্যতম, এক পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট হালকাতম মৌলটি হল হাইড্রোজেন। ‘পর্যায় সারণির’ প্রথম সদস্য হিসেবে হাইড্রোজেন একটা বিশেষ মর্যাদার দাবি রাখে। 1815 সালে প্রাউট (Prout) বললেন যে, হাইড্রোজেনকে সমস্ত মৌল সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাথমিক একক হিসেবে গণ্য করা চলে। আর বিভিন্ন মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্বের সরল গুণিতক (Simple multiple)। রসায়নবিদ স্টাস (Stas) বিভিন্ন মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয় করেন। পূর্ণসংখ্যা থেকে বিভিন্ন মৌলের পারমাণবিক গুরুত্বের বিচ্যুতি ধরা পড়ে এবং 1860 সালে প্রত্যাখ্যাত হয় প্রাউট-মতবাদ। মেন্ডেলেয়েভও তাঁর ‘পর্যায় সারণির’ প্রথম সদস্যকে বৈশিষ্ট্যমূলক মৌলগুলির মধ্যে সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৌল হিসেবে গণ্য করতেন।

বায়ুমণ্ডল, জলমণ্ডল ও স্থলমণ্ডলের উপাদানের ওজনের এক শতাংশ জুড়ে আছে হাইড্রোজেন। এটি মূলত যুক্ত অবস্থায় বর্তমান। ওজন হিসেবে জলের 11 শতাংশ, কাদা মাটির 1.5 শতাংশ হাইড্রোজেন। প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, শ্বেতসার, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ এবং জীবদেহের বিভিন্ন উপাদানে কার্বনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় হাইড্রোজেন বর্তমান। আগ্নেয়গিরি নির্গত গ্যাসে মুক্ত হাইড্রোজেনের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। বায়ুমণ্ডলের আয়তনের প্রায় 0.00005 শতাংশ হাইড্রোজেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রসায়নবিদগণ লক্ষ্য করছিলেন যে, লোহার ছিল্কার ওপর অ্যাসিড ঢাললে

বুদ্‌বুদ আকারে একটি গ্যাস নির্গত হয়, যাকে তাঁরা বাতাসের একটি দাহ্য রূপ হিসেবে গণ্য করতেন।

রুশ বিজ্ঞানী এম. ভি. লোমোনোসোভের (M. V. Lomonosov) 1745 সালে প্রকাশিত 'ধাতব ঔজ্জ্বল্য' সংক্রান্ত একটি গবেষণা পত্র 'On Metallic Lustre'- এ বলা হয়েছে যে লোহার মতো বিশেষ ধাতুগুলি আম্লিক কোহলে (acidic alcohols) দ্রবীভূত হয়ে জ্বলনশীল বাষ্প নির্গত করে, যাকে লোমোনোসোত 'ফ্লোজিস্টন' আখ্যা দেন। তখনকার দিনে অম্ল আম্লিক কোহল নামে পরিচিত ছিল।

1754 সালে কয়লা দহনে উৎপন্ন 'কার্বন ডাই- অক্সাইড' গ্যাস রসায়নবিদদের কাছে 'বদ্ধ বাতাস' (Fixed Air) রূপে পরিচিতি পায়। গ্যাসটি শ্বসন ও দহন ক্রিয়ায় সহায়তা করে না, জলে মোটামুটি দ্রাব্য ; বিজ্ঞানী ব্ল্যাক্ (Black) গ্যাসটির নাম দেন 'বদ্ধ বাতাস'।

1766 সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী ক্যাভেনডিশই প্রথম প্রমাণ করেন যে, লোহা, দস্তা ও টিনের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় একই ধরনের বাতাস' উৎপন্ন হয়, যাকে তিনি 'দাহ্য বাতাস' (Inflammable Air) বলে অভিহিত করেন। 'দাহ্য বাতাসের' ধর্ম পরীক্ষা কালে ফ্লোজিস্টিক তত্ত্বের অনুগামী ক্যাভেনডিশ মনে করেন যে, তিনি ফ্লোজিস্টনের ধর্মের পরীক্ষা করছেন। তিনিই প্রথম গ্যাসগুলির বৈশিষ্ট্য নিরূপণের ক্ষেত্রে গ্যাসের ঘনত্ব নির্ণয় করেন। সাধারণ বাতাসের ঘনত্ব এক ধরে 'দাহ্য বাতাস' এবং 'বদ্ধ বাতাসের' ঘনত্ব দাঁড়ায় যথাক্রমে 0.09 এবং 1.57। এখানেই ফ্লোজিস্টিক তত্ত্বের অনুগত ক্যাভেনডিশ ও গবেষক ক্যাভেনডিশের মধ্যে বিরোধ বাধে। গবেষক ক্যাভেনডিশ নির্ণীত 'দাহ্য বাতাসের' ধনাত্মক ভর ছিল ফ্লোজিস্টনের প্রস্তাবিত ঋণাত্মক ভরের পরিপন্থী।

বিজ্ঞানী ক্যাভেনডিশকেই হাইড্রোজেনের আবিষ্কর্তা গণ্য করা হয়, যদিও সমাজের একটি গোষ্ঠী বলতে চান যে, ক্যাভেনডিশ 'দাহ্য বাতাসের প্রস্তুত প্রণালী ও ধর্মগুলির বর্ণনা অনেক বিস্তারিত ভাবে করেছিলেন ঠিকই কিন্তু 'দাহ্য বাতাস' একটি গ্যাসীয় রাসায়নিক মৌল তা তিনি অনুধাবন করতে পারেন নি। আর ফ্লোজিস্টিক তত্ত্বের ফরমানই ছিল তার জন্য দায়ী। জলের গঠন নির্ধারণ করে 1783 সালে ল্যাভয়সিয়ের তথাকথিত 'দাহ্য বাতাসের' নাম দেন হাইড্রোজেন, জল তৈরির একটি উপাদান হিসেবে। বস্তুত তখন থেকে 'দাহ্য বাতাস' নামের আড়ালে লুকিয়ে থাকা গ্যাসটি একটি রাসায়নিক মৌল হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

হাইড্রোজেন প্রকৃতপক্ষেই বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। এর সমস্থানিকগুলির ধর্মাবলীর পার্থক্য একটা সময়ে এদের আলাদা মৌল হিসেবে বিবেচনার জন্য এবং 'পর্যায় সারণিতে' এদের আলাদা ঠাঁই দেবার জন্য বিজ্ঞানীদের প্ররোচিত করছিল। যদিও এখন প্রমাণিত যে এরা সবাই

এক ও অভিন্ন মৌল তবুও হাইড্রোজেনই একমাত্র মৌল যার সমস্থানিকগুলি ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন রাসায়নিক চিহ্নে ভূষিত। এক ভরসংখ্যা বিশিষ্ট সমস্থানিকের নাম হাইড্রোজেন বা প্রোটিয়াম, চিহ্ন H; দুই ভরসংখ্যা বিশিষ্ট সমস্থানিকের নাম ডয়টেরিয়াম (Deuterium), গ্রিক 'ডয়টেরস' (Deuteros) মানে "দ্বিতীয় অন্য একটি", চিহ্ন D এবং তিন ভরসংখ্যা বিশিষ্ট সমস্থানিকের নাম ট্রাইটিয়াম (Tritium), গ্রিক 'ট্রাইটস' (tritos) মানে তৃতীয়, চিহ্ন T।

1927 সালে বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ (Heisenburg) হাইড্রোজেনের দুটি রূপভেদের কথা জানালেন। রূপভেদ দুটির তারতম্য বড়ই সূক্ষ্ম, চেহারাছবিতে কিছুই ধরা পড়ে না— যেন নিতান্তই 'অন্দরমহলের' ব্যাপার। হাইড্রোজেন অণু দ্বি-পরমাণুক । একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন বিশিষ্ট হাইড্রোজেন পরমাণুর দুটির সংযোগে তৈরি হয় হাইড্রোজেন অণু। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রকে অবস্থিত প্রোটন দুটির ঘূর্ণন (Spins) একমুখী এবং বিপরীতমুখী হতে পারে। একমুখী ঘূর্ণনবিশিষ্ট রূপভেদটিকে বলা হয় অর্থো হাইড্রোজেন (Ortho hydrogen) এবং বিপরীতমুখী ঘূর্ণনবিশিষ্ট রূপভেদটির নাম প্যারা হাইড্রোজেন (Para hydrogen) (চিত্র -11)। অর্থো হাইড্রোজেন প্যারা হাইড্রোজেন অপেক্ষা বেশি সুস্থিত । সাধারণ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেনের অর্থো ও প্যারা রূপভেদ 3 : 1 অনুপাতে সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে।
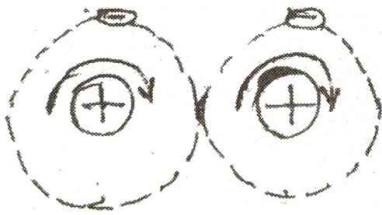
অর্থো হাইড্রোজেন
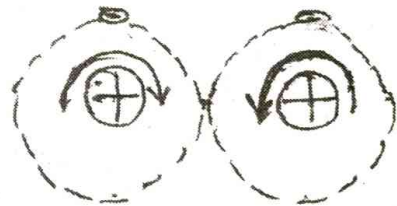
প্যারা হাইড্রোজেন

চিত্র - 11 ঃ অর্থো-প্যারা হাইড্রোজেন

সাধারণ বাতাস ছাড়াও বিজ্ঞানীরা বাতাসের তথাকথিত বদ্ধ রূপ (বদ্ধ বাতাস) ও দাহ্যরূপ (দাহ্য বাতাস) প্রত্যক্ষ করছিলেন। বাতাসের আরও কিছু কিছু রূপের কথাও শোনালেন বিজ্ঞানিগণ।

ক্যাভেনডিশ বায়ুমণ্ডলীয় বাতাসকে বারবার লোহিত তপ্ত কয়লার ওপর দিয়ে পাঠিয়ে উৎপন্ন গ্যাসকে ক্ষারের মধ্য দিয়ে প্রেরণ করেন। গ্যাস মিশ্রণের একটি অংশ (বদ্ধ বাতাস) ক্ষারে শোষিত হয়। অবশিষ্ট গ্যাসটিকে তিনি "অশ্বসনকারী বাতাস' বা 'বিষাক্ত বাতাস' (Mephitic Air) নামে অভিহিত করেন। ঘটনাটি তিনি পিস্টলেকে চিঠি লিখে জানান। পিস্টলে তখন অন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত-ক্যাভেনডিশের চিঠিটির যথাযথ গুরুত্ব দেন নি। প্রিস্টলে

নির্দিষ্ট পরিমাণ বাতাসে বিভিন্ন ধাতুর ভস্মীকরণের এবং দাহ্য বস্তুর দহনের ফলে বাতাসের আয়তন হ্রাসের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। পর্যবেক্ষণটির ব্যাখ্যায় তিনিও 'ফ্লোজিস্টন তত্ত্বে'র শরণ নেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ফ্লোজিস্টনের ক্রিয়াতেই ভস্মীকরণ বা দহন সংঘটিত হয়েছে। তাই অবশিষ্ট বাতাস ফ্লোজিস্টন সম্পৃক্ত হবে বিবেচনায় তিনি তার নাম দেন "ফ্লোজিস্টিকেটেড বাতাস' (Phlogisticated Air)।

ক্যাভেনডিশ বা প্রিস্ট্‌লে তাঁদের 'বিষাক্ত বাতাস' বা 'ফ্লোজিস্টিকেটেড বাতাসের' প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করতে পারেন নি। 1772 সালে ইংরেজ পদার্থবিদ ড্যানিয়েল রাদারফোর্ডের (Daniel Rutherford) "তথাকথিত বদ্ধ এবং বিষাক্ত বাতাস' (On the so called Fixed and Mephitic Air) শীর্ষক একটি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয় — তাতে নাইট্রোজেনের ধর্মের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, গ্যাসটি চুনজল বা ক্ষারে শোষিত হয় না এবং শ্বাসকার্যের জন্যও এটি উপযুক্ত নয়। ভি. রাদারফোর্ডকেই নাইট্রোজেন আবিষ্কারক হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি অবশ্য গ্যাসটির নাম দেন 'দূষিত বাতাস' (Corrupt Air)। অর্থাৎ 'বিষাক্ত বাতাস' 'ফ্লোজিস্টিকেটেড বাতাস', 'দূষিত বাতাস' বিশেষিত নামের ফাঁস কাটিয়ে নাইট্রোজেন নামে পরিচিতি পেতে নূতন গ্যাসীয় মৌলটির আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। 1787 সালে ল্যাভয়সিয়ের মৌলটির নাম প্রস্তাব করেন অ্যাজোট (Azote, "a" মানে no (নঞর্থক) এবং 'zoe' মানে life (জীবন) অর্থাৎ প্রাণধারণের অনুপযোগী। নাইটারের উপাদান হবার সুবাদে মৌলটির নাইট্রোজেন নাম চূড়ান্ত হয় 1790 সালে। নামটি প্রস্তাব করেন বিজ্ঞানী চাপটাল (Chaptal)।

প্রাচুর্যের নিরিখে নাইট্রোজেনের স্থান খুব একটা উপরে বলা যায় না। ভূ-পৃষ্ঠে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ওজন হিসেবে প্রায় 0.03 শতাংশ, বায়ুর 75.5 শতাংশ মুক্ত নাইট্রোজেন। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে প্রোটিনের রূপ ধরে, অজৈব নাইটার যৌগে মুক্ত অবস্থায় নাইট্রোজেন বর্তমান।

প্রাচুর্যের নিরিখে অক্সিজেনের স্থান সবার উপরে। ওজন হিসেবে বায়ুমণ্ডল, জলমণ্ডল ও স্থলমণ্ডলের প্রায় 50 শতাংশই অক্সিজেন। জীবদেহের বিভিন্ন উপাদানেও অক্সিজেন বর্তমান। ওজন হিসেবে বায়ুমণ্ডলের 23 শতাংশ মুক্ত অক্সিজেন; যুক্ত অবস্থায় জীবদেহের প্রায় 65 শতাংশ, মাটির 53 শতাংশ, কাদামাটির 56 শতাংশ অক্সিজেন। নাইট্রেট, সালফেট, কার্বোনেট প্রভৃতি লবণেও অক্সিজেন বর্তমান।

তোমরা জান, গ্যাসীয় পদার্থ বলতে একটা সময়ে শুধু বাতাসকেই বোঝানো হত। ক্রমশ বাতাসের বিভিন্ন রূপের কথাও জানা গেল। অক্সিজেনের পরিচিতির পটভূমিতে দেখা যায়, 1774 সালে ফরাসী রসায়নবিদ পি. বায়েন (P. Bayen) বললেন যে, ধাতুর ভস্মীকরণে

সাধারণ বাতাসের চেয়ে ভারী এক 'অদ্ভুত বাতাসের' সঙ্গে ধাতুর সংযোজন ঘটে ফলে ওজন বৃদ্ধি পায়। তিনি পারদ ঘটিত যৌগের তাপবিয়োজন ঘটিয়ে ঐ পদার্থটি (অদ্ভুত বাতাস) পেয়েছিলেন এবং লক্ষ্য করেছিলেন যে, ধাতব পারদ ঐ পদার্থটির সঙ্গে মিশে লাল যৌগে পরিণত হয়। বায়েন ঐ কাজে আর অগ্রসর হননি। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে তিনি জানতেই পারলেন না যে তাঁর 'অদ্ভুত বাতাস' অক্সিজেনই ছিল। বিজ্ঞান গবেষণায় এমনটি অবশ্য হামেশাই ঘটে চলেছে।

জে. প্রিস্ট্‌লে প্রথম অনুধাবন করেছিলেন যে, সবুজ গাছের উপস্থিতিতে 'বদ্ধ বাতাস' (শ্বসন অনুপযোগী) সাধারণ বাতাসে (শ্বসন সহায়ক) পরিবর্তিত হয়। ঘটনাটি শুধু রসায়নের ক্ষেত্রেই নয়, জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা এখন জান যে, "সালোক সংশ্লেষ" (Photosynthesis) একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যাতে সবুজ গাছ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে আর অক্সিজেন ত্যাগ করে। প্রিস্ট্‌লেই প্রথম জানিয়েছিলেন যে, সবুজ গাছ অক্সিজেন ত্যাগ করে।

পয়লা আগস্ট, 1774 সাল। প্রিস্ট্‌লে একটি আবদ্ধ পাত্রে লাল মারকারি অক্সাইড নিয়ে তার ওপর বড়ো লেন্সের সাহায্যে ঘনীভূত সূর্যকিরণ ফেলছিলেন। তাপ প্রয়োগে মারকারি অক্সাইড ভেঙে ধাতব মারকারি ও একটি গ্যাস তৈরি হয়। গ্যাসটি শ্বসন সহায়ক এবং জ্বলন ও দহন সহায়ক প্রমাণিত হয়। গ্যাসটি নিজে দাহ্য নয়। প্রিস্ট্‌লে এর নাম দিয়েছিলেন "ডিফ্লোজিস্টিকেটেড বাতাস' (Dephlogisticated Air)। বোঝাই যাচ্ছে, "ফ্লোজিস্টন তত্ত্বের ভূত" তখনও বিজ্ঞানীর মাথা থেকে নামে নি। প্রিস্ট্‌লে তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলের কথা ল্যাভয়সিয়েরকে জানালেন। ল্যাভয়সিয়ের তাঁর ইংরেজ বন্ধুর পরীক্ষালব্ধ ফলের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন যদিও প্রিস্ট্‌লের নিজের ধারণাই ছিল কল্পিত ফ্লোজিস্টিক তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন।

প্রায় একই সময়ে সুইডেনের বিখ্যাত রসায়নবিদ সি. শিলে অজৈব যৌগের বিয়োজনের মাধ্যমে একটি গ্যাসীয় পদার্থ প্রস্তুত করেন, যা জ্বলন সহায়কের কাজ করে। শিলে গ্যাসটির নাম দেন " অগ্নিগর্ভ বাতাস" (Fiery Air)। তিনি আরো প্রত্যক্ষ করেন যে, রাদারফোর্ডের "দূষিত বাতাস' ও তাঁর "অগ্নিগর্ভ বাতাসের" মিশ্রণ সাধারণ বাতাসের মতো আচরণ করে। বাতাস মৌল নয়, গ্যাসের মিশ্রণ — এই মতবাদটি তখন থেকেই পোক্ত হতে থাকে।

তখন 1774 সাল, ল্যাভয়সিয়ের অনুধাবন করেন যে, বাতাস ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট একাধিক গ্যাসের মিশ্রণ। এর একটি অংশ দহন ও জ্বলন সহায়ক এবং শ্বসন উপযোগী। লাল মারকারি অক্সাইড উত্তপ্ত করে উৎপন্ন গ্যাসটির নাম দেন ল্যাভয়সিয়ের "প্রাণদাত্রী বাতাস" (Life saving Air)।

1775 সালের এপ্রিল মাসে ল্যাভয়সিয়ের ফ্রান্সের অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস (Academy of Sciences)-এ "ধাতুর ভস্মীকরণে যুক্ত বস্তুর স্বরূপ এবং ওজন বৃদ্ধির বিবরণ" (Memoir on the Nature of the substance which combines with metals upon calcination and Increases of their weight) উপস্থাপন করেন। তিনি "প্রাণদাত্রী বাতাস" নামে অক্সিজেন আবিষ্কারের কথা বলেন। তিনি জানালেন যে, দহন, জারণ বা ধাতুর ভস্মীকরণ ফ্লোজিস্টন ত্যাগ করার মতো কোনো বিভাজন প্রক্রিয়া নয় বরং দহন বা জারণে বাতাসের (অক্সিজেন) সঙ্গে পদার্থের সংযোজন ঘটে। প্রত্যাখ্যাত হল ফ্লোজিস্টন তত্ত্ব। ফ্লোজিস্টিক তত্ত্বের 'নাগপাশে' আবদ্ধ ভ্রান্ত ধারণাগুলি সংশোধিত হল, জানা গেল, ধাতব অক্সাইড যা সরল বস্তু হিসেবে গণ্য হত তা আসলে যৌগ এবং ধাতু যা যৌগবস্তু হিসেবে গণ্য হত তা আসলে মৌল।

1779 সালে ল্যাভয়সিয়ের 'অম্লপ্রস্তুতকারী' বিবেচনায় তাঁর 'প্রাণদাত্রী বাতাসের' নামকরণ করেন অক্সিজেন। 'অম্ল প্রস্তুতকারক' ধারণাটি ছিল ভ্রান্ত। কার্বন, ফসফরাস, সালফার প্রভৃতির অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ যেমন আম্লিক, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতির অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ, তেমনি ক্ষারীয়। আর কিছু কিছু অম্লে (যেমন— হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, HCl) অক্সিজেন একেবারেই অনুপস্থিত।

অক্সিজেন আবিষ্কারের কৃতিত্ব বিজ্ঞানী পিস্টলে এবং শীলেকে দেওয়া হলেও বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ের এবং বায়েনের অবদানও এই ব্যাপারে কিছুমাত্র কম ছিল না। তোমরা বলতে পার, এই ব্যাপারে শুরুর কাজটা বায়েন সুন্দরভাবেই শুরু করেছিলেন এবং শেষের কাজটা ল্যাভয়সিয়ের সুচারু রূপেই সম্পন্ন করেছিলেন।

1840 সালে অক্সিজেনের একটি রূপভেদের পরিচয় মিলে। অক্সিজেন অণু দ্বিপরমাণুক (O_2)। অন্যদিকে তার রূপভেদটি ত্রিপরমাণুক (O_3) ; গন্ধ বিশিষ্ট হবার সুবাদে তার নাম হয় ওজোন (Ozone) ; গ্রিক 'ওজো' (Ozo) মানে 'আমি গন্ধ পাই' (I smell)। বায়ুতে খুব সামান্য পরিমাণে এবং বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ওজোনোস্ফিয়ারে ওজোন বেশি পরিমাণে বিদ্যমান। অক্সিজেন প্রাণদাত্রী গণ্য হলেও ঘনত্ব বেশি হলে ওজোন কিন্তু প্রাণঘাতী ভূমিকা নিতে পারে।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রকরণের অগ্রগতির সঙ্গে মৌলের সন্ধানে বৈশ্লেষিক রসায়ন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। খনিজের নাম থেকে নামকরণ হল একটি মৌলের। রূপার খনিজের মতো চেহারা দেখে খনি-শ্রমিকেরা খুব উৎসাহিত হল। তারা খনিজ থেকে রূপা নিষ্কাশনের অনেক চেষ্টা করল কিন্তু ব্যর্থ হয়ে খনিজকে বলতে লাগল 'কোবাল্ড' (Kobald),

জার্মান 'Kobald' মানে 'শয়তানের আত্মা'। খনি-শ্রমিকদের এই কথা শুনে শিয়ালের 'আঙুর ফল টক' উক্তিটি তোমাদের মনে পড়ছে, তাইতো ! পরবর্তী সময়ে ঐ খনিজ থেকে নিষ্কাশিত ধাতব মৌলটির নাম দেওয়া হয় কোবাল্ট (Cobalt)।

5000 বছর পূর্বে প্রাচীন গ্রিসে নীল কোবাল্ট কাচ, কোবাল্ট যুক্ত এনামেল এবং রঞ্জক পদার্থ জানা ছিল।

1735 সালে সুইডিশ রসায়নবিদ্ জি. ব্রান্ডট (G. Brandt) স্মলটাইট (Smaltite, $CoAs_2$) খনিজ থেকে কোবাল্ট নিষ্কাশন করেন।

অবস্থান, আচার-আচরণের ভিত্তিতে রসায়নবিদ্‌গণ আয়রণ, কোবাল্ট ও নিকেলকে তিনমিত্র হিসেবে গণ্য করেন এবং মৌল ত্রয়ী (triads of elements) বলে অভিহিত করেন। প্রাচুর্যের নিরিখে ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 1.5 শতাংশ আয়রণ, 0·001 শতাংশ কোবাল্টএবং 0·003 শতাংশ নিকেল। কোবাল্টের পারমাণবিক সংখ্যা 27, রাসায়নিক চিহ্ন Co।

আয়রণ, কোবাল্ট, নিকেল এই মৌল ত্রয়ীর অনুরূপ আরও দুটি শ্রেণীর ত্রয়ী মৌলরা হল রুথেনিয়াম (Ruthenium), রোডিয়াম (Rhodium), প্যালাডিয়াম (Palladium) এবং অসমিয়াম (Osmium), ইরিডিয়াম (Iridium), প্লাটিনাম (Platinum)। এরা সবাই প্রকৃতিতে একসঙ্গে অবস্থান করে। তাই এরা একযোগে প্লাটিনাম মৌলসমূহ নামে (The Platinum Metals) পরিচিত। রুথেনিয়াম, রোডিয়াম, প্যালাডিয়ামকে বলা হয় হালকা প্লাটিনাম মৌল এবং অসমিয়াম, ইরিডিয়াম ও প্লাটিনামকে বলা হয় ভারী প্লাটিনাম মৌল।

প্রাচুর্যের নিরিখে ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 9×10^{-7} শতাংশ রুথেনিয়াম, 2×10^{-8} শতাংশ রোডিয়াম, 2×10^{-7} শতাংশ প্যালাডিয়াম, 5×10^{-7} শতাংশ অসমিয়াম, 9×10^{-9} শতাংশ ইরিডিয়াম, 5×10^{-8} শতাংশ প্লাটিনাম।

প্লাটিনাম প্রকৃতিতে ধাতুসংকর অসমিরিডিয়ামে (Osmiridium) বিরাজ করে, যা অসমিয়ামেরও উৎস। প্লাটিনাম-সমৃদ্ধ আকরিকে প্লাটিনাম মৌলসমূহ ছাড়া কপার, সিলভার, গোল্ডেরও দেখা মিলে।

প্লাটিনাম মৌলসূমহের মধ্যে সবার আগে, সম্ভবত 1748 সালে প্লাটিনামের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটে। প্লাটিনামের পারমাণবিক সংখ্যা 78, রাসায়নিক চিহ্ন Pt।

কোবাল্টের প্রতিবেশী মৌলটির নাম নিকেল (Nickel) হয়েছে জার্মান শব্দ 'কুপফের নিকেল' (Kupfer nickel) খনিজ থেকে, যার অর্থ 'শয়তানের তামা'' ! 1694 সালে সুইডিশ খনিজবিদ্ ইউ. হিয়ের্ণের (U. Hierne) লেখাতে এর উল্লেখ আছে। কুপফের নিকেলকে তামার একটি

আকরিক মনে করে তামা নিষ্কাশনের যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। তামা আহরণে ব্যর্থ হয়ে ধাতুবিদ্‌গণ এটি 'পাহাড়ের দুরাত্মা'— "নিকের" (Nick) কারসাজি বলে ধরে নেন।

1751 সালে সুইডিশ রসায়নবিদ্ এ. ক্রোন্‌স্টেডট্ (A. Cronstedt) খনিজটির অ্যাসিড দ্রবণে একটি লোহার দণ্ড ডুবিয়ে পরীক্ষা করেন। লোহার দণ্ডে কোনোরকম তামার প্রলেপ না পড়ায় তিনি বুঝতে পারেন যে, খনিজে তামা অনুপস্থিত। একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ক্রোন্‌স্টেডট্ কুপফের নিকেল খনিজ থেকে একটি ধাতব মৌল আলাদা করেন এবং খনিজের নাম কুপফের নিকেলকে ছেঁটে মৌলটির নামকরণ করেন নিকেল। নিকেলের পারমাণবিক সংখ্যা 28, রাসায়নিক চিহ্ন Ni।

ফ্লোরিণ খুব সক্রিয় তাই মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে কখনও এর দেখা মিলেনি। যুক্ত অবস্থায় ফ্লোরিন ফ্লোরোস্পার (Fluorspar, CaF_2), ক্রায়োলাইট (Cryolite, Na_3AlF_6) খনিজে বর্তমান। ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 0·02 শতাংশ হচ্ছে ফ্লোরিণ।

1771 সালে বিজ্ঞানী শীলে ফ্লোরোস্পার ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড উত্তপ্ত করে একটি অজ্ঞাত অ্যাসিড প্রস্তুত করেন। অ্যাসিডটির নাম রাখা হয়েছিল "সুইডিশ অ্যাসিড"। বিজ্ঞানী ডেভি প্রমাণ করেন যে, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং শীলের প্রস্তুত করা "সুইডিশ অ্যাসিডের" সংযুতি একই রকম। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে যেমন হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত আছে ক্লোরিন তেমনি তথাকথিত "সুইডিশ অ্যাসিডে" হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত আছে একটি নূতন অজ্ঞাত মৌল। ডেভি মৌলটির নাম, তার উৎস ফ্লোরোস্পারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দিয়েছিলেন ফ্লোরিন। বলা হয়, ফরাসী বিজ্ঞানী এ. অ্যামপিয়ার (A. Ampere) মৌলটির একই নাম প্রস্তাব করেন তার "বিধ্বংসী" চরিত্রের জন্য, গ্রিক শব্দ "ফটোরস" (ftoros) মানে বিধ্বংসী। কারণ ফ্লোরিণ সক্রিয়তম মৌলদের অন্যতম, ফলে পরীক্ষাপাত্র ও তড়িৎদ্বারে ব্যবহৃত পদার্থকে ফ্লোরিন গ্রাস করত। "সুইডিশ অ্যাসিড", ছদ্মনামের আড়াল থেকে বেরিয়ে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড নামে পরিচিতি পেল। ফ্লোরিন এবং হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড অতীব বিষাক্ত। তাই এদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো ছিল খুবই বিপদজনক।

প্রকৃত অর্থে 1771 সালকে ফ্লোরিণের জন্ম সাল হিসেবে গণ্য করা যায় না। কারণ একাধিক বিজ্ঞানীর ব্যাপক চেষ্টা সত্ত্বেও হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড থেকে ফ্লোরিণকে মুক্ত করা যায় নি। যদিও ফ্লোরিণের নাম ধাম ও প্রকৃতির একটি রূপরেখা বিজ্ঞানীরা তুলে ধরেছিলেন তবুও মুক্ত অবস্থায় ফ্লোরিণকে পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও 100 বছরেরও বেশি সময়। 1886 সালে ফরাসী রসায়নবিদ্ ময়সাঁ (Moissan) ফ্লোরিণ প্রস্তুত করেন।

মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে ক্লোরিণ পাওয়া যায় না। এটি খাদ্য লবণের (NaCl) একটি উপাদান।

ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 0.02 শতাংশ হচ্ছে ক্লোরিণ।

1774 সালে শীলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে পাইরোলুসাইট চূর্ণের (প্রাকৃতিক ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড) সঙ্গে উত্তপ্ত করে ক্লোরিণ প্রস্তুত করেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় এক্ষেত্রে "দাহ্য বাতাসই" তৈরি হবে। কিন্তু তথাকথিত "দাহ্য বাতাসের" সঙ্গে উৎপন্ন গ্যাসটির কোনো মিল ছিল না। গ্যাসটি ছিল অপ্রীতিকর গন্ধদায়ক, হরিদ্রাভ সবুজ রং বিশিষ্ট এবং বিরঞ্জন ক্ষমতা সম্পন্ন। ফ্লোজিস্টিক তত্ত্বের অনুগামী শীলে গ্যাসটিকে 'ফ্লোজিস্টন হারা' গ্যাস বলে গণ্য করলেন এবং নাম দিলেন "ডিফ্লোজিস্টিকেটেড মিউরিক অ্যাসিড" (Deplogisticated Muric Acid) কারণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে বলা হত "মিউরিক অ্যাসিড" (Muric acid); ল্যাটিন "মিউরিয়া" (Muria) লবণ জল বুঝায়।

অন্যদিকে, ফ্লোজিস্টিক তত্ত্বের বিরোধী এবং "অ্যাসিড অক্সিজেন ধারক" মতবাদের প্রবর্তক ল্যাভয়সিয়ের শীলের "ডিফ্লোজিস্টিকেটেড মিউরিক অ্যাসিডকে" মিউরিক অ্যাসিড ও অক্সিজেনের যৌগ অর্থাৎ "জারিত মিউরিক অ্যাসিড" হিসেবে গণ্য করলেন এবং নাম দিলেন "অক্সি মিউরিক অ্যাসিড" (Oxymuric acid)।

তোমরা বলতে পার দুই বিখ্যাত রসায়নবিদ্‌ই তাঁদের পূর্ব ধারণার প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে প্রতারিত হয়েছিলেন অর্থাৎ তাঁরাও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে এগোতে পারেন নি। সংস্কার বিষয়টিই বোধহয় এমন— কোনো না কোনো সংস্কার তোমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে, যদিও তোমাদের কেউ কেউ সংস্কারমুক্ত বলে দাবি করতে পছন্দ করেন। তোমাদের কি মনে হয় না যে যথার্থ সংস্কারমুক্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে বড়ই কঠিন ? তোমাদের অবশ্য সেই কঠিন কাজটিই করে দেখাতে হবে। 1810 সালে ডেভি নূতন পদার্থটির মৌলিকত্ব প্রমাণ করেন এবং নাম দেন ক্লোরিণ, মৌলটির হরিদ্রাভ সবুজ রঙ বাহারের জন্য।

প্রধান উৎস পাইরোলুসাইট (MnO_2) খনিজের ল্যাটিন নাম "ম্যাঙ্গানেসিয়াম" (Manganesium) থেকে মৌলটির নাম হয়েছে ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)। এর পারমাণবিক সংখ্যা 25, রাসায়নিক চিহ্ন Mn। ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 0.03 শতাংশ হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ।

সম্ভবত 1770 সালে অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী আই. কেইমই (I. Kaim) প্রথম একভাগ পাইরোলুসাইট ও দুইভাগ কয়লা এবং পটাসিয়াম কার্বোনেটের মিশ্রণ উত্তপ্ত করে ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুত করেছিলেন, অবশ্য তিনি তাঁর গবেষণাটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পর্যন্ত চালিয়ে যান নি।

1774 সালে শীলে পাইরোলুসাইট থেকে ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুত করেন এবং তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফল

"On Manganese and Its Properties" স্টকহলম্ অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্সেস্ (Stockholm Academy of Sciences)-এ পেশ করেন।

প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় বেরিয়াম পাওয়া যায় না। উইদেরাইট (Witherite, $BaCo_3$) এবং বারাইটস্ (Barytes) বা হেভিস্পার (Heavy spar, $BaSO_4$) খনিজে বেরিয়াম বর্তমান। ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 0.005 শতাংশ হচ্ছে বেরিয়াম।

1602 সালে বোলোগনার (ইতালি) এক চর্মকার ভি. ক্যাস্সিয়ারালো (V. Casciaralo) হেভিস্পারকে কয়লা ও তেল সহযোগে উত্তপ্ত করেন। সাধারণ তাপমাত্রায় ঠান্ডা হয়ে উৎপন্ন পদার্থটি লালচে দীপ্তি ছড়ায়, যা বেরিয়াম সালফাইডের কাজ বলে পরবর্তী সময়ে গণ্য করা হয়।

1774 সালে শীলে হেভিস্পারে একটি অজ্ঞাত মৃত্তিকার উপস্থিতির কথা জানালেন, যার নাম দেওয়া হয় "ব্যারাইটা"। ল্যাভয়সিয়েরের 'সরল বস্তুর তালিকায়' (The Table of Simple Bodies) ব্যারাইটার ও উল্লেখ আছে। ডেভি 1808 সালে বেরিয়াম প্রস্তুত করেন। বলা হয়, বেরিয়াম নামটি যৌগিক উৎস ব্যারাইটস থেকে এসেছে। কেউ কেউ মনে করেন গ্রিক শব্দ "ব্যারোস" (Baros) মানে ভারী, থেকে নামটি নেওয়া হয়েছে কারণ এটির খনিজ ছিল বেশ ভারী।

1775 সাল পর্যন্ত আমাদের যে চব্বিশজন সদস্যদের সঙ্গে তোমাদের পূর্বপুরুষের পরিচয় হয়েছিল তারা হল ঃ কার্বন, সালফার, গোল্ড, সিলভার, কপার, আয়রণ, টিন, লেড, মারকারি, অ্যান্টিমনি,ফসফরাস, আর্সেনিক, বিসমাথ, জিংক, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কোবাল্ট, প্লাটিনাম, নিকেল, ফ্লোরিণ, ক্লোরিণ, ম্যাঙ্গানিজ এবং বেরিয়াম।

তোমাদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা যেমন দিনে দিনে বাড়ে তেমনি আমাদের সদস্যদেরও কারো কারো ক্ষেত্রে পরিচিতি ঘনিষ্ঠতা পেতে আরও সময় লেগেছিল।

সীসার খনিজ (লেড গ্ল্যান্স, PbS)-এর গ্রিক নাম দেওয়া হয়েছিল "মলিবডেনা"। "মলিবডেনা"র মতো দেখতে একটি অজ্ঞাত খনিজকে বলা হত "মলিবডেনাইট" (Molybdenite)। অজ্ঞাত খনিজে যে মৌলটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল সেটি বিরল মৌলদের একটি। খনিজের নাম অনুসারে মৌলটির নাম হয়েছিল মলিবডেনাম (Molybdenum)। এর পারমাণবিক সংখ্যা 42, রাসায়নিক চিহ্ন Mo। প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় এর সন্ধান মেলেনি। ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 3×10^{-4} শতাংশ হচ্ছে মলিবডেনাম। মূলত মলিবডেনাইট খনিজে (MoS_2) এটি বর্তমান।

1778 সালে শীলে মলিবডেনাইটের সঙ্গে ঘন নাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে একটি ভারী সাদা রঙের পদার্থ পান যাকে তিনি 'বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৃত্তিকা' আখ্যা দেন এবং এর নাম দেন 'মলিবডিক অ্যাসিড'। 'মলিবডিক অ্যাসিড' উচ্চ তাপে উত্তপ্ত করে তিনি একটি অক্সাইড যৌগ তৈরি করেন এবং অনুধাবন করেন যে তিনি একটি নূতন মৌলের অক্সাইড প্রস্তুত করেছেন। 1790 সালে শীলের পরামর্শ মতো তাঁর বন্ধু পি. জেলম (P. Hjelm) 'সাদা মৃত্তিকাকে' কয়লা সহযোগে উত্তপ্ত করে মলিবডেনাম প্রস্তুত করেন যদিও মৌলটি বিশুদ্ধতার দাবি করতে পারেনি। 1817 সালে জে. বার্জিলিয়াস মলিবডেনাম অক্সাইড হাইড্রোজেন সহযোগে বিজারিত করে বিশুদ্ধ মলিবডেনাম প্রস্তুত করেন।

মলিবডেনাম 'পরিবারভুক্ত' আরেকটি বিরল মৌল হচ্ছে টাংস্টেন। জার্মানিতে টাংস্টেন কথাটা 'নেকড়ের লালা' (Wolf's froth) সূচিত করে। ধাতুবিদ্‌রা লক্ষ্য করছিলেন যে, খনিজ বিশেষ থেকে টিন বিগলনে, বিগলিত ধাতুর একটি অংশ লোপ পায় যা পুনরুদ্ধার করা যায় না। খনিকর্মীরা বিশ্বাস করতেন যে, আকরিকে এমন কিছু আছে যা টিনকে খেয়ে ফেলে যেমন নেকড়ে ভেড়াকে খেয়ে ফেলে। তাই খনিজটির নাম হয়েছিল টাংস্টেন বা উল ফ্রেমাইট (Wolframite, $FeWO_4$, $MnWO_4$) । সুইডেনে টাংস্টেন ভারী পাথর নির্দেশ করে। প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় টাংস্টেন পাওয়া যায় না। ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 6×10^{-4} শতাংশ হচ্ছে টাংস্টেন। 1781 সালে শীলে উলফ্রেমাইট থেকে টাংস্টেন প্রস্তুত করেন।

প্রকৃতিতে টেলুরিয়াম অতি অল্প পরিমাণে বর্তমান। ঔজ্জ্বল্যের জন্য তার নাম পড়েছিল অর‍্যাম প্যারাডক্সাম (Aurum Paradoxum)। প্রাচুর্যের নিরিখে ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 1×10^{-7} শতাংশ হচ্ছে টেলুরিয়াম। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অস্ট্রিয়ার সপ্ত পাহাড় অঞ্চলে একটি অদ্ভুত নীলচে সাদা আকরিকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। 1782 সালে খনি ইঞ্জিনিয়ার আই. মুলার (I. Muller) এবং পরবর্তী সময়ে ভন রেইচেনস্টেইন (Von. Reichenstein) ঐ আকরিক থেকে একটি অবিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশন করেন এবং অনুধাবন করেন যে একটি নূতন মৌলের জন্ম হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত প্রতিপন্ন করার জন্য মুলার তাঁর গবেষণার সবকিছু জানিয়ে জার্মান রসায়নবিদ্ এম. ক্লপরথকে (M. Klaproth) আকরিকের কিছু অংশ পাঠান। ক্লপরথ মুলারের পদ্ধতি অনুসরণ করেই মৌলটি প্রস্তুত করেন এবং তার নাম দেন টেলুরিয়াম। 1798 সালের 25 জানুয়ারি ক্লপরথ তাঁর গবেষণালব্ধ ফল বার্লিন একাডেমি অব্ সায়েন্সেস-এ পেশ করেন। ক্লপরথ অবশ্য টেলুরিয়াম আবিষ্কারের কৃতিত্বের ভাগ পূর্বসূরীদের দেন নি।

প্রাচুর্যের দিক থেকে এগিয়ে থাকা ধাতব মৌলের অন্যতম মৌলটির নাম জার্কোনিয়াম। ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 3×10^{-3} শতাংশ হচ্ছে জার্কোনিয়াম। মূলত মূল্যবান পাথুরে আকরিক 'জার্কোনে' ($ZrSiO_4$) এটি বিরাজ করে।

1789 সালে ক্লপরথ সুন্দর পাথরের আবরণটি উন্মোচন করে মৌলটিকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করেন। তিনি রূপার ক্রুসিবিলে জার্কোন চূর্ণ ক্ষার সহযোগে উত্তপ্ত করে উৎপন্ন পদার্থটি সালফিউরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করেন। দ্রবণ থেকে ক্লপরথ একটি 'মৃত্তিকা' পৃথক করেন এবং তার নাম দেন জার্কোনিয়াম। বিশুদ্ধ ধাতব জার্কোনিয়াম প্রস্তুতি মোটেই সহজ ছিল না। 1808 সালে ডেভি তড়িৎপ্রবাহ পাঠিয়ে জার্কোনিয়াম মৃত্তিকাকে বিভাজিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি। 1824 সালে বার্জিলিয়াস প্লাটিনাম ক্রুসিবিলে বিশুদ্ধ পটাশিয়াম, পটাশিয়াম ফ্লোরাইড এবং জার্কোন চূর্ণ উত্তপ্ত করে জার্কোনিয়াম ধাতু প্রস্তুত করেন।

প্রকৃতিতে জানা শেষ মৌলটির নাম ইউরেনিয়াম তা তোমরা জান। এর প্রধান আকরিক পিচ ব্লেন্ড (Pitch blende, UO_2)। ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 2×10^{-5} শতাংশ হচ্ছে ইউরেনিয়াম। 1789 সালে ক্লপরথ পিচ ব্লেন্ডে একটি নূতন মৌলের সন্ধান পান এবং মৌলটির নাম দেন ইউরেনিয়াম। আত্মপ্রকাশের জানান দেবার পর ইউরেনিয়াম ছিল, বলতে গেলে, অবহেলিত ও উপেক্ষিত। এর ব্যবহার শুধুমাত্র রঙিন কাচ প্রস্তুতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

1896 সালে ময়সা তড়িৎচুল্লীতে ইউরেনিয়াম ধাতু গলিয়ে একটি বাট তৈরি করেন এবং ধাতুর বাটটি বিজ্ঞানী হেন্‌রী বেকরলকে (Henry Becqueral) উপহার দেন। ঐ বছরেই বেকরেল ধাতুর বাট থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। অর্থাৎ ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয় মৌল বলে গণ্য হয় আর তখন থেকেই সে বিজ্ঞানীদের সজাগ দৃষ্টি কেড়ে নেয়। রাতারাতি ইউরেনিয়ামের কদরও বহুলাংশে বেড়ে গেল। রাষ্ট্রনায়ক এবং সমরনায়কেরাও হাত বাড়ালেন ইউরেনিয়ামের দিকে। ইউরেনিয়ামের তিনটি প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক হল ইউরেনিয়াম— 234 (প্রাচুর্য 0·006%, অর্ধ আয়ুষ্কাল $2 \cdot 48 \times 10^5$ বছর), ইউরেনিয়াম-235 (প্রাচুর্য 0·7%, অর্ধ আয়ুষ্কাল $7 \cdot 1 \times 10^8$ বছর) এবং ইউরেনিয়াম— 238 (প্রাচুর্য 99·274%, অর্ধ আয়ুষ্কাল $4 \cdot 5 \times 10^9$ বছর)।

1938 সালে বিজ্ঞানী অটো হ্যান, ফ্রাইটজ্ ট্রাসম্যান এবং কুমারী লিজে মেইটনার প্রথম ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন ঘটান। তারা দেখলেন যে, নিউট্রনগুলির আঘাতে ইউরেনিয়াম-235 সমস্থানিকের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে দু'টুকরো হয়ে যায়। তৈরী হয় 36 প্রোটন সংখ্যা ও 92 ভরসংখ্যা বিশিষ্ট মৌল ক্রিপ্টন এবং 56 প্রোটন ও 140 ভরসংখ্যা বিশিষ্ট মৌল বেরিয়াম আর উদ্ভূত হয় প্রভূত শক্তি।

সমকালীন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রেক্ষিতে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউরেনিয়াম অচিরেই প্রভূত শক্তির উৎস হতে যাচ্ছে। তিনি তাঁর উপলব্ধির কথা মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টকে (Franklin D. Roosevelt) 1939 সালের 2 রা আগস্ট একটি চিঠিতে জানালেন। শক্তি উৎসের সন্ধান পেলে একদল বিজ্ঞানী পুলকিত বোধ করেন, মানব কল্যাণে শক্তি উৎস প্রয়োগের দিশা খোঁজেন আর আরেক দল লোক বিশেষত রাষ্ট্রনায়কেরা ও সমরনায়কেরা আধিপত্য বিস্তারের ভাবনায় শক্তি উৎসের অপপ্রয়োগের পথ বেছে নেন— আর এ ব্যাপারেও এক শ্রেণীর বিজ্ঞানীরাই সহায়তা দিয়ে থাকেন। আমেরিকাতেও ম্যানহাটন প্রোজেক্টের আড়ালে বিজ্ঞানী ফার্মী ও ওপেন হাইমারের অধীনে 'পরমাণু চুল্লী' ও 'পরমাণু বোমা' তৈরির কাজ জোর কদমে এগিয়ে চলল। বিশ্ববাসীর অজান্তে 1945 সালের 16 ই জুলাই নিউ মেক্সিকোর মরু অঞ্চলে প্রথম পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হল। তোমরা জান, তার পরের ইতিহাস বড়ই করুণ— বড়ই অমানবিক। 1945 সালের 6 ই আগস্ট ইউরেনিয়াম- 235 অ্যাটম বোমা (লিটিল বয়) জাপানের হিরোশিমা শহরে নিক্ষেপ করা হল। নাগাসাকিতে প্লুটোনিয়াম-239 অ্যাটম বোমা (ফ্যাটম্যান) নিক্ষেপ করা হয় 9ই আগস্ট। মানব ইতিহাসের এই জঘন্যতম ধ্বংসলীলার ভয়াবহতায় স্তম্ভিত হল সারা বিশ্ব। শুনতে পাই বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশই পরমাণু শক্তিধর। আর গোপনে আরও অনেক দেশই পরমাণুর ধ্বংসলীলার চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনও শোনা যায় যে, সন্ত্রাসবাদীরাও বসে নেই। তারাও পরমাণুর ধ্বংসবিদ্যা আয়ত্তের এবং পরমাণু বোমা অধিগ্রহণের জন্য সচেষ্ট।

প্রকৃতির কোলে বর্তমান মানুষের জানা শেষ মৌলটি প্রভূত শক্তির উৎস হিসেবে একদিকে মানবসভ্যতা বিকাশের এবং অন্যদিকে মানবসভ্যতা ধ্বংসের দুয়ার খুলে দিল। তোমরাই এখন ঠিক করবে কোন্ দুয়ার খোলা রাখবে এবং কোন্ দুয়ার বন্ধ করবে। তোমাদের বিজ্ঞানী অটো হ্যান কিন্তু বলেছিলেন যে, ধ্বংসলীলায় পরমাণুর ব্যবহার ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় (Contrary to God's will)।

1787 সালে স্কটল্যান্ডের স্ট্রনসিয়া গ্রামে সীসার খনিতে একটি নূতন খনিজের সন্ধান পাওয়া যায়। তার নাম দেওয়া হয় গ্রামের নাম অনুসারে স্ট্রনসিয়ানাইট (Strontianite, $SrCO_3$)। 1790 সালে এক স্কটিশ ডাক্তার এ. ক্রউফোর্ড (A. Crawford) স্ট্রনসিয়ানাইটে একটি নূতন মৌলের উপস্থিতির কথা জানালেন, যার নাম দেওয়া হল স্ট্রনসিয়াম। 1791 সালে স্কটিশ রসায়নবিদ্ টি. হোপ (T. Hope) স্ট্রনসিয়ানাইট নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণালব্ধ ফল ডাক্তার ক্রউফোর্ডের মতামতের সঙ্গে ছিল সঙ্গতিপূর্ণ। অবশ্য নিশ্চিত ভাবে একটি ধাতব মৌলের মর্যাদা পেতে স্ট্রনসিয়ামকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। 1808 সালে ডেভি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন যে, স্ট্রনসিয়াম একটি নূতন ধাতব মৌল।

স্ট্রনসিয়াম প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। ভু-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 0.008 শতাংশ হচ্ছে স্ট্রনসিয়াম।

1794 সালে ফিনিশ রসায়নবিদ্ জোহান গ্যাডোলিন সুইডেনের একটি গ্রাম ইটারবিতে একটি খনিজের সন্ধান পান— গ্রামের নাম অনুসারে খনিজটির নাম দেওয়া হল 'ইটারবাইট', পরবর্তী সময়ে খনিজের নাম গ্যাডোলিনের সম্মানে করা হয় 'গ্যাডোলিনাইট'। ইটারবাইট থেকে একটি অজানা মৌলের অক্সাইড প্রস্তুত করেন গ্যাডোলিন। তিনি মৌলটির নাম দেন ইট্রিয়াম। এটি ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 5×10^{-4} শতাংশ।

প্রাচুর্যের নিরিখে সামনের সারিতে থাকা মৌলদের একটি হচ্ছে টাইটানিয়াম। এটি ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 0·2 শতাংশ জুড়ে মৌলদের মধ্যে নবম স্থানে আছে।

ইংরেজ ধর্মযাজক ডবলু গ্রেগর (W. Gregor) সখ করে রসায়ন চর্চা করতেন এবং বিভিন্ন খনিজের গঠন নিয়ে গবেষণা করতেন। বিজ্ঞানী বার্জিলিয়াস তাঁকে বিশিষ্ট খনিজবিদ্ বলে সম্মান দেখাতেন। যাজক পল্লীতে (ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য) অবস্থিত মেনাসিন (Menaccin) উপত্যকার মিশ্রিত সাদা-কালো বালির স্তূপ গ্রেগরকে আকৃষ্ট করে। তিনি 1791 সালে কালো বালির কণা আলাদা করে বিশ্লেষণ করেন। অভিজ্ঞতার আলোকে কালো বালিকে গ্রেগর একটি নূতন মৌলের উৎস বলে মনে করেন। অতি বিনয়ী গ্রেগর তাঁর কাজটি সম্পূর্ণ সম্পন্ন দাবি করেন নি বরং তিনি তাঁর খনিজবিদ্ বন্ধু ডি. হকিন্সকে (D. Hawkins) সবকিছু জানান। কালো বালিতে একটি নূতন মৌল বর্তমান বলেই মতামত দেন হকিন্স। বালির উৎসস্থল মেনাসিনের নামে গ্রেগর বালির নাম প্রস্তাব করেন 'মেনাসাইট' (Menaccite) বর্তমানে যার পোষাকি নাম ইলমেনাইট (Ilmenite, $FeTiO_3$), এবং মৌলটির নাম প্রস্তাব করেন মেনাসিন (Menaccin)।

হাঙ্গেরী থেকে আনা, বর্তমানে রুটাইল (Rutile, TiO_2) নামে পরিচিত, খনিজ থেকে ক্লপরথ 1795 সালে একটি নূতন মৌলের অক্সাইড পৃথক করেন। তিনি মৌলটির নাম দেন টাইটানিয়াম। মৌলটি এখন ঐ নামেই পরিচিত। গ্রেগরের মেনাসিন মৃত্তিকা ও ক্লপরথের পাওয়া অক্সাইড অভিন্ন প্রতিপন্ন হয়েছিল। 1825 সালে বার্জিলিয়াস বিশুদ্ধ টাইটানিয়াম নিষ্কাশন করেন। রঞ্জন কণা ও খাদ হিসেবে টাইটানিয়ামের বাণিজ্যিক কদর আছে।

1766 সালে জার্মান বিজ্ঞানী আই. লেহম্যান (I. Lehmann) সাইবেরিয়া থেকে প্রাপ্ত খনিজ 'ক্রোকোইসাইট' (Crocoisite)-কে সীসার খনিজ বলে মনে করতেন। আসলে খনিজটি ছিল লেড ক্রোমেট ($PbCrO_4$)। কোনো কোনো উল্কাতে স্বল্প পরিমাণে মুক্ত অবস্থায় ক্রোমিয়ামের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে মোট পরমাণুর 6×10^{-3} শতাংশ হচ্ছে ক্রোমিয়াম।

1797 সালে বিখ্যাত ফরাসী রসায়নবিদ্ এল. ভ্যান কুইলিন (L. Vanquelin) ক্রোকোইসাইটে

নূতন মৌলের উপস্থিতির কথা জানালেন এবং বর্ণময় যৌগের জননী হবার সুবাদে মৌলটির নাম দিলেন ক্রোমিয়াম।

ভূ-পৃষ্ঠের পরমাণুর 0.001 শতাংশ হচ্ছে বেরিলিয়াম। 1798 সালে ভ্যানকুইনিন ফিকে সবুজ পাথর বেরিল ($Be_3AL_2(SiO_3)_6$ থেকে একটি অজ্ঞাত ধাতব অক্সাইড তৈরি করেন। ধাতুটির নাম বেরিল পাথরের নামানুসারে রাখা হয় বেরিলিয়াম। 1828 সালে ভোলার (Wohler) বেরিলিয়াম ধাতু প্রস্তুত করেন।

1776 সাল থেকে 1800 সাল পর্যন্ত আমাদের যেসব সদস্যদের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটেছিল তারা হল ঃ মলিবডেনাম, টাংস্টেন, টেলুরিয়াম, জার্কোনিয়াম, ইউরেনিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, ইট্রিয়াম, টাইটানিয়াম, ক্রোমিয়াম এবং বেরিলিয়াম।

আচার-আচরণের সাদৃশ্য, একই খনিজে বিরাজ করার প্রবণতা এবং খনিজ থেকে মুক্ত অবস্থায় আহরণের জটিলতা নূতন মৌল দুটিকে চিনে নিতে বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট বেগ দিয়েছিল।

1801 সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী সি হ্যাটচেট (C. Hatchett) উত্তর আমেরিকা থেকে সংগ্রহ করা এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি কালো আকরিক বিশ্লেষণ করে একটি নূতন মৌলের সন্ধান পান। প্রাপ্তিস্থানের সম্মানার্থে হ্যাটচেট খনিজটির নাম দেন 'কলম্বাইট' (Columbite)। তোমরা জান, কলম্বাসের আবিষ্কারের সূত্রে আমেরিকার নাম হয়েছিল কলম্বিয়া। আর তাই মৌলটির নাম দেন কলম্বিয়াম (Columbium)।

1802 সালে সুইডিশ রসায়নবিদ্ এ. একবার্গ (A. Ekberg) ইটারবুল গ্রাম থেকে পাওয়া এবং কলম্বাইটের মতো দেখতে একটি খনিজ বিশ্লেষণ করেন। তিনি মৌলটির অক্সাইড প্রস্তুত করেন এবং তীব্র অ্যাসিডে তা দ্রবীভূত করার চেষ্টা করেন। অক্সাইডকে দ্রবীভূত করার সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় একবার্গ মৌলটির নাম দেন ট্যান্টালাম। নামটি এসেছে গ্রিক পুরাণের রাজা ট্যান্টালাসের যন্ত্রণা (torments of Tantalus) থেকে, যার মানে ব্যর্থ প্রচেষ্টা। খনিজটার নাম দেওয়া হয় "ট্যান্টালাইট" (Tantalite)।

1809 সালে ইংরেজ রসায়নবিদ ভি. ওল্লাসটন (V. Wollaston) জানালেন যে, হ্যাটচেটের কলম্বিয়াম ও একবার্গের ট্যান্টালাম এক এবং অভিন্ন মৌল।

প্রায় তিন দশক পরে 1844 সালে এইচ. রোজ (H. Rose) কলম্বাইটে নূতন দুটি মৌলের সন্ধান পান— একটি ট্যান্টালাম, আরেকটির তিনি নাম দিলেন, ট্যান্টালাসের কন্যা নায়োবির নাম অনুসারে, নায়োবিয়াম। অর্থাৎ হ্যাটচেটের কলম্বিয়াম নায়োবিয়াম নামে পরিচিতি পেল। জানা গেল মৌল দুটি একই সঙ্গে "কলম্বাইট" বা "নাইয়োবাইট" (Niobite, $Fe(NbO_3)_2$)

এবং "ট্যান্টালাইট" ($Fe(TaO_3)_2$) খনিজে বর্তমান। প্রথম খনিজটি নায়োবিয়াম-সমৃদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি ট্যান্টালাম-সমৃদ্ধ। তাই বিশুদ্ধ অবস্থায় এদের আহরণ করা ছিল যথেষ্ট সমস্যাসংকুল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ডবলু. ভন. বোলটেন (W. von Bolten) বিশুদ্ধ নায়োবিয়াম ও ট্যান্টালাম প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। ভূ-পৃষ্ঠের পরমাণুর 2×10^{-4} শতাংশ হচ্ছে নায়োবিয়াম, 2×10^{-54} শতাংশ ট্যান্টালাম।

ল্যান্থানাম সারির মৌলগুলি 'পর্যায় সারণিতে' একই ঘরে অবস্থান করে। প্রকৃতিতেও তারা মোটামুটি একই সঙ্গে বিরাজ করে এবং প্রকৃতির কোল থেকে এদের আলাদা করে আহরণ করা মোটেই সহজ ছিল না। তাই এদের বলা হত 'বিরল মৃত্তিকা' (Rare earth), যদিও প্রাচুর্যের নিরিখে এদের অনেকের চেয়ে বিরলতর মৌল অনেক আছে। ল্যান্থানাম সারির সদস্য সেরিয়াম প্রাচুর্য বিচারে কপারের কাছাকাছি।

1803 সালে একদিকে বার্জিলিয়াস এবং ডবলু. হিসিংগার (W. Hisinger) অন্যদিকে ক্লপরথ সুইডেন থেকে পাওয়া একটি খনিজ স্বাধীনভাবে বিশ্লেষণ করে নূতন মৌলের অক্সাইড প্রস্তুত করেন। মৌলটির নাম রাখা হয় সেরিয়াম এবং খনিজটির নাম দেওয়া হয় "সেরাইট"(Cerite)। মোনাজাইট (Monazite) বালিতেও ল্যান্থানাম গোষ্ঠীর অনেক সদস্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রাজিলিয়ান খনিকর্মিগণ প্রকৃতিতে এক অদ্ভুত সংকর ধাতুর সন্ধান পান। সম্ভবত এটি ছিল প্লাটিনাম ও সোনার ধাতুসংকর। 1803 সালে রসায়নবিদ্ ওল্লাসটন ধাতু সংকরটি অর্থাৎ অবিশুদ্ধ প্লাটিনাম নিয়ে গবেষণা চালিয়ে একটি নূতন মৌলের সন্ধান পান। মৌলটির নাম দেওয়া হয় প্যালাডিয়াম। 1809 সালে ওল্লাসটন জানালেন যে, প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায়ও প্যালাডিয়ামের দেখা পাওয়া যায়।

1804 সালে সম্ভবত ব্রাজিল থেকে পাওয়া অবিশুদ্ধ প্লাটিনামেই ওল্লাসটন আরেকটি নূতন মৌলের সন্ধান পান। গোলাপি রংয়ের লবণ তৈরির সুবাদে মৌলটির নামকরণ করা হয় রোডিয়াম। প্রাচুর্যের দিক থেকে প্লাটিনাম ধাতুসমূহের মধ্যে পিছিয়ে থাকা মৌলদের একটি হচ্ছে রোডিয়াম।

গবেষণা চালিয়ে ইংরেজ রসায়নবিদ এস. টেন্নান্ট (S. Tennant) 1804 সালে অবিশুদ্ধ প্লাটিনামে আরও নূতন দুটি মৌলের সাক্ষাৎ পেলেন। মৌল দুটির নাম অসমিয়াম ও ইরিডিয়াম। 1805 সালে 'প্লাটিনাম দ্রবীভূত হওয়ার পর উৎপন্ন অনিয়তাকার কালো পদার্থ থেকে পাওয়া দুটি ধাতু সম্বন্ধে' (On Two Metals Found in the Black Powder Formed after Dissolution of Platinum) শীর্ষক টেন্নান্টের প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে অসমিয়াম

এবং ইরিডিয়াম ধাতুর উল্লেখ আছে।

ক্ষারীয় ধাতু (Alkali Metals) দুটি সোডিয়াম ও পটাশিয়াম এবং ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতু (Alkaline Earth Metals) দুটি ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালসিয়ামকে মৌল হিসেবে জানার অনেক আগে থেকেই মানুষ এদের বিভিন্ন যৌগের ব্যবহার জানত। খাদ্যলবণ, পটাশ, চুন, ম্যাগনেশিয়া প্রভৃতির ব্যবহার মানুষ কখন শুরু করে তা সঠিক বলা যায় না। সোডিয়াম ও পটাশিয়াম কার্বোনেট কাপড় কাচার জন্য ব্যবহৃত হত, খাদ্যলবণ হিসেবে ব্যবহৃত সোডিয়াম লবণ (ক্লোরাইড) উঁচু দামে বিকোত, কখনও কখনও নুনের খনির অধিকার নিয়ে যুদ্ধ বেঁধে যেত। ম্যাগনেশিয়াম যৌগ অ্যাসবেসটস, ট্যালকম , ডলোমাইট প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে মানুষ সুদূর অতীত থেকে ব্যবহার করে আসছে। 1618 সালে ইংল্যান্ডের ইপসম নামক জায়গায় এইচ. উয়িকার (H. Wiker) খনিজ পদার্থ মিশ্রিত একটি ঝর্না আবিষ্কার করেন। 1695 সালে ইপসম ঝর্নার জলে একটি লবণের অস্তিত্ব ধরা পড়ে, পরবর্তী সময়ে যা ইপসম লবণ ($MgSO_4$, $7H_2O$) নামে পরিচিত হয় এবং ওষুধে ব্যবহৃত হয়। বহুকাল ধরেই মানুষ চুনাপাথর, জিপসাম প্রভৃতি ক্যালসিয়াম খনিজের ব্যবহার জানত।

সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম খুবই সক্রিয়। তাই মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে এদের দেখা পাওয়া যায় না। এরা যুক্ত অবস্থায় বিভিন্ন খনিজে এবং যৌগে বর্তমান। ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 1.3 শতাংশ সোডিয়াম, 1.1 শতাংশ পটাশিয়াম 1.4 শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম এবং 1.5 শতাংশ ক্যালসিয়াম।

চুন, ম্যাগনেশিয়া, সোডা, পটাশ প্রভৃতি দীর্ঘদিন 'সরল বস্তু' হিসেবে গণ্য হয়ে আসছিল। বস্তুত এদের থেকে সংশ্লিষ্ট মৌলকে পৃথক করার ক্রিয়াকৌশল মানুষ তখনও আয়ত্ত করতে পারেনি।

1807 সালে ডেভি গলিত অনার্দ্র পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে যথাক্রমে পটাশিয়াম ও সোডিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করেন। অনুরূপ ভাবে ডেভি 1808 সালে ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালসিয়াম প্রস্তুত করেন।

যুক্ত অবস্থায় বোরন বোরিক অ্যাসিড (H_3BO_3), সোহাগা বা বোরাক্স (Borax, $Na_2B_4O_7$, $10H_2O$) প্রভৃতিতে বর্তমান। মানুষ মধ্যযুগ থেকেই সোহাগার ব্যবহার জানত। খ্রিস্ট্রীয় প্রথম সহস্রাব্দের প্রথম দিকে ধাতু ঝালাইয়ের কাজে সোহাগার ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। 1702 সালে ডাচ ডাক্তার ডবলু. হোমবার্গ (W. Homberg) সোহাগাকে সালফিউরিক অ্যাসিড সহযোগে উত্তপ্ত করে বোরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করেন যা "হোমবার্গের প্রশান্তিদায়ক লবণ" (Homberg's sedative salt) নামে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হত। মুক্ত অবস্থায়

প্রকৃতিতে বোরনের দেখা পাওয়া যায়নি। ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর প্রায় 5×10^{-4} শতাংশ হচ্ছে বোরন।

1808 সালে ডেভি বোরিক অ্যাসিড ধাতব পটাশিয়াম সহযোগে বিজারিত করে বোরন প্রস্তুত করেন। প্রায় একই সময়ে অনুরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে বোরন প্রস্তুত করেন ফরাসি রসায়নবিদ এল. থেনার্ড (L. Thenard) এবং এল. জে. গেলুসাক (L. J. Gay-Lussac)।

প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় আয়োডিন পাওয়া যায় না। যুক্ত অবস্থায় সামান্য পরিমাণে সমুদ্রের জলে, সামুদ্রিক উদ্ভিদে, চিলি সল্টপিটারে, জীবদেহের থাইরয়েড গ্রন্থিতে, কড লিভার তেলে আয়োডিন অবস্থান করে। ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর প্রায় 4×10^{-6} শতাংশ হচ্ছে আয়োডিন।

1811 সালে ফরাসি বিজ্ঞানী বার্নার্ড কুরুয় (Bernard Courtois) সামুদ্রিক উদ্ভিদের ভস্মে আয়োডিনের সন্ধান পান। তিনি সামুদ্রিক শৈবাল ভস্ম জলে দ্রবীভূত করে বাষ্পীভূত করেন। প্রথমে সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও সালফেট অধঃক্ষিপ্ত হয়। অবশিষ্ট দ্রবণে কুরুয় সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করছিলেন। অ্যাসিডের মাত্রা বেশি হতেই তিনি অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। একদিকে বিক্রিয়ক মিশ্রণ থেকে বেগুনি রঙের অদ্ভুত সুন্দর মেঘ বাষ্পের উদয় অন্যদিকে অপ্রীতিকর গন্ধ ও বাষ্পের অশ্রুনিঃসারী ক্রিয়া। কুরুয় অবাক। তারপর বেগুনি বাষ্প তরলে পরিণত না হয়ে ধাতব ঔজ্জ্বল্য বিশিষ্ট গাঢ় রঙের কঠিনে পরিণত হল। বেগুনি রঙের জন্য গে- লুসাক মৌলটির নাম দেন আয়োডিন।

সবচেয়ে হালকা ধাতু হল প্রকৃতিতে আবিষ্কৃত ক্ষারীয় ধাতুর তৃতীয় সদস্য। প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় এর দেখা মিলেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে ব্রাজিলিয়ান বিজ্ঞানী জে. অ্যান্ড্রেডা ই. সিলভা (J. Andrada e Silva) দেশভ্রমণে বেরিয়ে সুইডেনের অন্তর্গত ইউটো (Uto) দ্বীপ থেকে দুটি নূতন খনিজ সংগ্রহ করেন। খনিজ দুটির তিনি নাম দেন স্পোডুমিন (Spodumene, $LiAl(SiO_3)_2$) এবং পেটালাইট (Petalite, $LiAl(Si_2O_5)_2$)।

1817 সালে সুইডিশ রসায়নবিদ্ আই. আর্ফভেড্সন (I. Arfvedson) পেটালাইট খনিজ বিশ্লেষণ করে 80% সিলিকন অক্সাইড, 17% অ্যালুমিনা এবং 3% একটি নূতন ক্ষার ধাতু পান। পাথুরে খনিজে সন্ধান মিলেছিল বলে ক্ষার ধাতুটির নাম হয় লিথিয়াম (Lithium), গ্রিক শব্দ "লিথিয়োস" (lithios) মানে পাথর।

ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর প্রায় 0·02 শতাংশ হচ্ছে লিথিয়াম। এর পারমাণবিক সংখ্যা 3, রাসায়নিক চিহ্ন Li।

জিংক শ্রেণীর একটি মৌল প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় বিরাজ করে না। মৌলটি মূলত জিংক খনিজে বর্তমান এবং প্রাচুর্যের নিরিখে পিছিয়ে থাকা মৌলদের একটি। 1817 সালে গটিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক এফ. স্ট্রোমেয়ার (F. Stromeyer) জিংক কার্বোনেট ভস্মীকরণে জাত হলুদ রঙের যৌগ থেকে একটি নূতন মৌল পৃথক করেন। প্রাকৃতিক জিংক কার্বোনেটকে গ্রিক ভাষায় বলা হয় ''ক্যাডমিয়া'' আর তার থেকেই মৌলটির নাম হয়েছে ক্যাডমিয়াম (Cadmium)। বিরল ক্যাডমিয়াম খনিজটির নাম ''গ্রিনক্‌কাইট'' (Greenockite, Cds)। ভূপৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 8×10^{-6} শতাংশ হচ্ছে ক্যাডমিয়াম। এর পারমাণবিক সংখ্যা 48, রাসায়নিক চিহ্ন Cd।

আচার-আচরণে মিল থাকায় মৌলটি সালফার ও টেলুরিয়ামের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। 1817 সালে বার্জিলিয়াস ও তাঁর সহকর্মী জি. গাহ্‌ন (G. Gahn) চেম্বার পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন কারখানা পরিদর্শন কালে লেড চেম্বারের মেঝেতে লাল কঠিন পদার্থের জমাট লক্ষ্য করেন। লাল কঠিন পদার্থে তাঁরা একটি নূতন মৌলের সন্ধান পান, যার নাম দেওয়া হয় সেলেনিয়াম। পৃথিবীর ল্যাটিন নাম ''টেলুরিস'' থেকে সমধর্মী মৌলের টেলুরিয়াম নামকরণের ভিত্তিতে চাঁদের ল্যাটিন নাম ''সেলেনে'' অনুসারে নূতন মৌলটির নাম দেওয়া হয়েছে সেলেনিয়াম। ভূ-পৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 1×10^{-5} শতাংশ হচ্ছে সেলেনিয়াম। এর ছটি রূপভেদ বর্তমান।

ল্যাটিন নাম ''সিলিসিয়াম'' (Silicium), ল্যাটিন শব্দ ''সিলেক্স'' (Silex, মানে শক্ত পাথর) উদ্ভূত। আর তার থেকেই ভূ-পৃষ্ঠের ভিত্তিপ্রস্তর গড়ার দাবিদার মৌলটির নামকরণ হয়েছে সিলিকন (Silicon)। প্রাচুর্যের নিরিখে অক্সিজেনের পরে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী মৌলটি মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে বিরাজ করে না। যুক্ত অবস্থায় সিলিকা (SiO_2) এবং ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট (SiO_3) রূপে সিলিকন বর্তমান। যন্ত্রপাতিতে সিলিকনের ব্যবহার মানুষ আদিমকাল থেকেই করে আসছে। কাচ একরকম সিলিকন পদার্থ, যার ব্যবহার মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই জানে। প্রাচুর্যে ভরপুর থেকেও মুক্ত অবস্থায় সিলিকনের আত্মপ্রকাশ ঘটতে যথেষ্ট সময় লেগেছে বলতে পার। আর যুক্ত অবস্থা থেকে একে মুক্তি দেবার পথ বের করতেই বিজ্ঞানীদের বিলম্ব ঘটছিল বলা যায়।

সিলিকনের দুটি রূপভেদের মধ্যে একটি অনিয়তাকার, অন্যটি নিয়তাকার। 1811 সালে এল. জে. গে-লুসাক এবং এল. থেনার্ড উত্তপ্ত ধাতব পটাশিয়ামের উপর সিলিকন টেট্রা- ক্লোরাইড বাষ্প পাঠিয়ে অবিশুদ্ধ অনিয়তাকার সিলিকন প্রস্তুত করেন। 1823 সালে বার্জিলিয়াস বিশুদ্ধ অনিয়তাকার সিলিকন প্রস্তুত করেন। এ. সেন্ট ক্লেইরে ডেভিলে (A. Saint Claire Deville) নিয়তাকার সিলিকন প্রস্তুত করেন 1854 সালে।

সিলিকনের পারমাণবিক সংখ্যা 14, রাসায়নিক চিহ্ন Si।

প্রাচীনকাল থেকেই অ্যালুমিনিয়ামের বিভিন্ন যৌগের সঙ্গে তোমাদের পূর্বপুরুষদের পরিচয় ছিল। ইট-মাটি হল মূলত ভূ-পৃষ্ঠে বর্তমান প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী মৌল অক্সিজেন, সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়ামের যৌগ— অ্যালুমিনো সিলিকেট (Alumino silicate, Al_2O_3, SiO_2 XH_2O) চুনি, গার্নেট, নীলা, পোখরাজ প্রভৃতি মূল্যবান পাথরের অন্যতম প্রধান উপাদান হল— অ্যালুমিনিয়াম। সুদূর অতীত থেকেই মানুষ এদের ব্যবহার করে আসছে। শুনতে পাই সৌভাগ্য ও স্বাস্থ্য লাভের আশায় তোমাদের মাঝে "পাথর ধারণের" প্রবণতা বিদ্যমান। আর এ নিয়ে একটা ব্যবসাও গজিয়ে উঠেছে। গোটা ব্যাপারটা তোমরা সমীক্ষা করে দেখেছ কি?

অ্যালুমিনিয়াম যৌগের ব্যবহার জানা থাকলেও তাতে একটি নূতন মৌলের অস্তিত্বের কথা জানতে বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিন সময় লেগেছিল। প্রাচুর্যের নিরিখে তৃতীয় স্থানাধিকারী অ্যালুমিনিয়াম প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় বিরাজ করে না। যুক্ত অবস্থায় অক্সাইড রূপে করান্ডাম বা রুবি (Corundum / Ruby, Al_2O_3), হাইড্রোক্সাইড রূপে বক্সাইট (Bauxite, Al_2O_3, $3H_2O$), সিলিকেট রূপে পটাশ-ফেলস্‌পার (Potash-felspar, K_2O, Al_2O_3, 6 SiO_2) , ফ্লোরাইড রূপে ক্রায়োলাইট (Cryolite, AlF_3 , 3NaF) খনিজে অ্যালুমিনিয়াম বর্তমান।

1825 সালে ডেনিশ বিজ্ঞানী এইচ. ওরস্টেড (H. Oersted) অ্যালুমিনা (Al_2O_3) ও কাঠকয়লার মিশ্রণকে উত্তপ্ত করে তার মধ্য দিয়ে ক্লোরিন পাঠিয়ে অনার্দ্র অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্রস্তুত করেন, যা পটাশিয়াম-পারদ সংকর সহযোগে উত্তাপের ফলে অ্যালুমিনিয়াম-পারদ সংকরে পরিণত হয়। পাতনের মাধ্যমে পারদ দূর করে ওরস্টেড অবিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করেন। তাঁর গবেষণালব্ধ ফল স্বল্পখ্যাত ডেনিশ জার্নালে প্রকাশিত হয় এবং বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়।

1827 সালে এফ. ভোলার (F. Wohler) বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করেন। 1854 সালে বিজ্ঞানী ডেভিলে অ্যালুমিনিয়ামের শিল্পোৎপাদন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন।

বর্ধিত সঞ্চয় ভাণ্ডার আবিষ্কারের এবং নিষ্কাশন পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনের ফলে অত্যন্ত মূল্যবান "মৃত্তিকা রূপা" (Clay Silver) বলে খ্যাত অ্যালুমিনিয়াম এখন সাধারণের ব্যবহার উপযোগী হিসেবে মানব সমাজে প্রবেশ করেছে।

1801 সাল থেকে 1825 সাল পর্যন্ত আমাদের যেসব সদস্য আত্মপ্রকাশের জানান দিয়েছিল তারা হল ঃ

নায়োবিয়াম, ট্যান্টালাম, সেরিয়াম, প্যালাডিয়াম, অসমিয়াম, ইরিডিয়াম, রোডিয়াম, সোডিয়াম,

পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, বোরন, আয়োডিন, লিথিয়াম, ক্যাডমিয়াম, সেলেনিয়াম, সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম।

হ্যালোজেন গোষ্ঠীর সদস্য অধাতব একমাত্র তরল মৌলটি প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় বিরাজ করে না। সমুদ্র জলে সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় এবং স্টাসফার্ট (Stassfurt) লবণ স্তূপে মৌলটি বর্তমান।

1825 সালের শরৎকাল। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে সি. লোভিগ (C. Lowig) নামে এক ছাত্র অধ্যাপক এল. গ্মেলিনের (L. Gmelin) অধীনে গবেষণারত। একদিন ছাত্রটি বদ্‌গন্ধযুক্ত লালচে বাদামি রঙের তরলে ভর্তি একটি ফ্লাস্ক নিয়ে শিক্ষকের সামনে এসে জানালেন যে ক্রেইজনাচ (Kreiznach) শহরের কাছে তার দেশের বাড়ির সন্নিকটে অবস্থিত খনিজ সমৃদ্ধ ঝর্নার জলে ক্লোরিন গ্যাস পাঠিয়ে ফ্লাস্কের তরলটি পাওয়া গেছে। অধ্যাপক গ্মেলিন তাঁর ছাত্রকে উৎসাহিত করে অধিক পরিমাণে বস্তুটি প্রস্তুত করতে এবং বস্তুটির ধর্ম নিরূপণ করতে নির্দেশ দিলেন। লোভিগ ইথার ব্যবহার করে লালচে বাদামি রঙের পদার্থটি নিষ্কাশন করেন। লোভিগ যখন পুরোদমে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন "সমুদ্র জলে উপস্থিত বিশেষ পদার্থ সম্বন্ধে বিবরণ (Memoir on a specific substance in Sea Water) শীর্ষক ফ্রান্সের বিজ্ঞানী এ. জে. ব্যালার্ডের (A. J. Balard) একটি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়। লোভিগের বদগন্ধযুক্ত লালচে বাদামি তরলের সঙ্গে ব্যালার্ডের 'বিশেষ পদার্থের' ধর্মের সম্পূর্ণ মিল প্রতিপন্ন হয়। ব্যালার্ড লবণ জলের ল্যাটিন নাম "মিউরিয়া' অনুসারে সামুদ্রিক শৈবাল থেকে নিষ্কাশন করা তাঁর 'বিশেষ বস্তুটির' নাম দেন "মিউরাইড" (Muride)। 1825 সালের 30 নভেম্বর ব্যালার্ড তাঁর গবেষণাপত্রটি "প্যারিস অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস" -এ পাঠান। অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ ব্যালার্ডের গবেষণা পত্রটি খতিয়ে দেখার জন্য গে-লুসাক, ভ্যানকুয়েলিন ও থেনার্ডকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সদস্যগণ ব্যালার্ডের পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করেন। কিন্তু বদগন্ধের জন্য মৌলটির নাম সুপারিশ করেন ব্রোমিন। বলতে পার 1826 সালের 14 আগস্ট ব্রোমিন নামে অধাতব একমাত্র তরল মৌলটির আত্মপ্রকাশ ঘটল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। ব্রোমিন মৌল হিসেবে বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃতি পাবার বছর কয় আগে একটি জার্মান প্রতিষ্ঠান এক বোতল তরল পদার্থ শনাক্তকরণের জন্য বিজ্ঞানী জে. লাইবিগের (J. Liebig) কাছে পাঠায়। লাইবিগ নমুনাটি বিশদ্‌ভাবে বিশ্লেষণ না করেই সিদ্ধান্ত নেন যে তরলটি ক্লোরিন ও আয়োডিনের একটি যৌগ। ব্যালার্ডের ব্রোমিন আবিষ্কারের কাহিনি প্রকাশিত হবার পর লাইবিগ বোতলের অবশিষ্ট তরলটি বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারেন যে জার্মান প্রতিষ্ঠানের পাঠানো নমুনাটি ছিল ব্রোমিন। পরিচিত মহলে মনের খেদ গোপন রাখতে পারেননি লাইবিগ, বলতে লাগলেন, "ব্রোমিনকে ব্যালার্ড আবিষ্কার করেননি, ব্রোমিনই ব্যালার্ডকে আবিষ্কার করেছে।"

ভূপৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 3×10^{-5} শতাংশ হচ্ছে ব্রোমিন।

নরওয়ের সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত লেভেন দ্বীপ থেকে জি. এস্‌মার্ক (G. Esmark) একটি ভারী কালো রঙের খনিজ সংগ্রহ করেন এবং খনিজের একটি নমুনা বার্জিলিয়াসকে পাঠিয়ে দেন। বার্জিলিয়াস খনিজটি বিশ্লেষণ করে 1828 সালে একটি নূতন মৌলের সিলিকেট যৌগ পৃথক করেন। তিনি খনিজটির নাম দেন থোরাইট (Thorite, $ThSiO_4$) এবং মৌলের নামকরণ করেন থোরিয়াম। মোনাজাইট বালিতেও থোরিয়ামের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। প্রাচুর্যের নিরিখে ভূপৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 6×10^{-5} শতাংশ হচ্ছে থোরিয়াম। ইউরেনিয়ামের পর থোরিয়াম হল দ্বিতীয় প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় মৌল যা রাসায়নিক বিশ্লেষণের পথ ধরেই ধরা দিয়েছে। পারমাণবিক জ্বালানি হিসেবে থোরিয়াম এখন চাহিদার তালিকায় উপরের দিকে স্থান করে নিয়েছে।

মেক্সিকোর সিমাপান (Cimapan) গ্রামের কাছ থেকে সংগ্রহ করা একটি লেড আকরিক বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক অ্যানড্রেস ম্যানুয়েল ডেলরিয়ো (Andres Manuel Del Rio) 1801 সালে জানালেন যে ঐ খনিজে ক্রোমিয়াম ও ইউরেনিয়াম সদৃশ একটি নূতন মৌল বর্তমান। ডেল রিয়ো মৌলটির একাধিক যৌগ প্রস্তুত করেন যা ছিল বিভিন্ন রঙের। তাই তিনি মৌলটির নাম রাখেন "প্যানক্রোমিয়াম" (Panchromium), গ্রিক ভাষায় যার অর্থ "সব রঙে রঞ্জিত"। যেহেতু যৌগগুলি অ্যাসিড সহ উত্তপ্ত করলে লাল লবণে পরিণত হয় তাই ডেল রিয়ো মৌলটির নাম পরিবর্তন করে নূতন নাম দেন "এরিথ্রোনিয়াম" (Erythronium), গ্রিক "এরিথ্রোস" (Erythros) মানে লাল।

1830 সালে সুইডিশ রসায়নবিদ সেফ্‌স্ট্রম (Sefstrom) সুইডেনের টাবার্গ (Taberg) খনি থেকে পাওয়া আয়রন আকরিকে একটি নূতন মৌলের সন্ধান পান, সুন্দর রঙিন যৌগ তৈরির জন্য, যার নাম দেওয়া হয় ভ্যানাডিয়াম।

1831 সালে ভোলার প্রমাণ করেন যে ডেল রিয়োর এরিথ্রোনিয়াম এবং সেফ্‌স্ট্রমের ভ্যানাডিয়াম এক এবং অভিন্ন মৌল এবং মেক্সিকোর লেড আকরিক ছিল লেড ভ্যানাডেট। শেষ পর্যন্ত মৌলটি ভ্যানাডিয়াম নামেই পরিচিত হয়।

ভূপৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 0.005 শতাংশ হচ্ছে ভ্যানাডিয়াম। এর প্রধান আকরিক হল কার্নোটাইট (Carnotite $K_2(UO_2)_2\ (VO_4)_2$, $3H_2O$ এবং ভ্যানাডিনাইট (Vanadinite, $3Pb_3\ (VO_4)_2$, Pbd_2)।

1826 সালে বার্জিলিয়াসের ছাত্র সি. মোসান্ডার (C. Mosander) মনে করেন যে সেরাইট খনিজ থেকে নিষ্কাশিত মৌল সেরিয়াম বিশুদ্ধ ছিল না। তিনি সেরিয়াম নিয়ে গবেষণা শুরু

করেন এবং 1839 সালে সেরিয়ামে আরেকটি মৌলের অস্তিত্বের প্রমাণ পান। নূতন মৌলটির নামকরণ করা হয় ল্যান্থানাম।

মোনাজাইট বালি ল্যান্থানাম ও ল্যান্থানাইড সারির বিভিন্ন মৌলের প্রধান উৎস। ভূপৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 2×10^{-4} শতাংশ হচ্ছে ল্যান্থানাম।

1843 সালে মোসান্ডার ইট্রিয়ামের উৎস ইটারবাইট খনিজ বিশ্লেষণ করে আরও নূতন দু'টি মৌলের সন্ধান পান। মৌল দুটির নামকরণ করা হয় এরবিয়াম ও টারবিয়াম। প্রকৃতিতে প্রাচুর্যের নিরিখে এরা নীচের দিকেই স্থান পেয়েছে।

রুশ বিজ্ঞানী কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রথম রাসায়নিক মৌলটির নাম রাশিয়ার নামানুসারে হয়েছিল রুথেনিয়াম। রুশ বিজ্ঞানী কার্ল ক্লাউস (Karl Klaus) 1844 সালে অবিশুদ্ধ প্ল্যাটিনাম বিশ্লেষণ করে নূতন মৌল রুথেনিয়ামের সন্ধান পান। প্রকৃতিতে প্রাচুর্য বিচারে রুথেনিয়াম বিরল মৌলদের একটি গণ্য হতে পারে।

1826 সাল থেকে 1850 সাল পর্যন্ত যে কয়টি মৌলের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়েছিল তারা হল ঃ ব্রোমিন, থোরিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, ল্যান্থানাম, টারবিয়াম, এরবিয়াম ও রুথেনিয়াম।

মৌলের আত্মপ্রকাশের ইতিহাসের দিকে তাকালে তোমরা দেখতে পাবে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতি দশকেই রাসায়নিক মৌলের তালিকায় নূতন নূতন মৌলের সংযোজন ঘটেছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকটি ছিল এর ব্যতিক্রম। ঐ সময়ে কোনো নূতন মৌলের সন্ধান বিজ্ঞানীরা পান নি যদিও বৈশ্লেষিক রসায়ন তখন অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছিল।

1859-1860 সালে জার্মান বিজ্ঞানী আর. বুনসেন (R. Bunsen) এবং জি. কিরচফ (G. Kirchoff) বর্ণালি বিশ্লেষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন আর বর্ণালি বিশ্লেষণের কাছে নূতন মৌলের বন্ধ দুয়ার খুলে গেল। জানা গেল একটি মৌল তার বৈশিষ্ট্যমূলক বর্ণালির মাধ্যমে নিজের পরিচয় দিতে পারে। আর অল্প মাত্রায় মৌলের উপস্থিতিও বর্ণালি বিশ্লেষণ পরীক্ষায় সাড়া দেয়। বর্ণালি বিশ্লেষণ পদ্ধতির পথ ধরেই বিজ্ঞানিগণ নূতন মৌল সিজিয়াম, রুবিডিয়াম, থ্যালিয়াম এবং ইন্ডিয়ামের পরিচয় পেলেন।

1860 সালে বুনসেন ও কিরচফ ডুর্খেইম (Durkheim) এর খনিজ সমৃদ্ধ ঝর্নার জলের বিশ্লেষণে বর্ণালিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। আসমানি রঙের প্রাপ্ত বর্ণালি একটি নূতন মৌলের অস্তিত্ব নির্দেশ করে আর বর্ণালি অনুসারেই মৌলটির নামকরণ হয় সিজিয়াম। সিজিয়াম অতি নরম ধাতু এবং 28^0 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার উপরে তরল অবস্থা ধারণ করে। ভূপৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 0.00009 শতাংশ হচ্ছে সিজিয়াম। অন্যান্য ক্ষারীয় ধাতুর সঙ্গে সিজিয়াম ও রুবিডিয়াম অবিশুদ্ধি হিসেবে সচরাচর বিরাজ করে।

1861 সালে বুনসেন ও কিরচফ সুইজারল্যান্ডের সাক্সনি থেকে প্রাপ্ত লেপিডোলাইট খনিজে (Lepidolite, $K_2Li_3 Al_4 Si_7 O_{21} (OH, F)_3$) বর্ণালি বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে একটি নূতন মৌলের সন্ধান পান। লাল বর্ণালির জন্য মৌলটির নামকরণ হয় রুবিডিয়াম। ভূপৃষ্ঠের মোট পরমাণুর 0.004 শতাংশ হচ্ছে রুবিডিয়াম। 1863 সালে বুনসেন ধাতব রুবিডিয়াম প্রস্তুত করেন।

বর্ণালি বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সিজিয়াম এবং রুবিডিয়াম মৌলের আবিষ্কার ইংরেজ বিজ্ঞানী ডবলু ক্রুক্স্‌কে (W. Crookes) যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। 1861 সালে ক্রুক্স্‌ক সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনে লেড চেম্বারে পড়ে থাকা উপজাত তলানির বর্ণালি বিশ্লেষণ করে সবুজ রেখা সৃষ্টিকারী একটি নূতন মৌলের সন্ধান পান। মৌলটির নাম দেওয়া হয় থ্যালিয়াম। 1862 সালে "থ্যালিয়াম— একটি নূতন রাসায়নিক মৌল" (Thallium – a New Chemical Element) শীর্ষক কুক্সকের একটি গবেষণা পত্র "কেমিক্যাল নিউজ" (Chemical News) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

1866 সালে বিখ্যাত পর্যটক, খনিজবিদ ও গ্রিনল্যান্ড অভিযানের অন্যতম সদস্য ই. নর্ডেনশোল্ড (E. Nordenshold) সিলভার, কপার, সেলেনিয়াম ও থ্যালিয়াম বিশিষ্ট একটি খনিজ আবিষ্কার করেন এবং ক্রুকসের সম্মানার্থে খনিজটির নাম দেন "ক্রুকসাইট"(Crookesite)। ভূপৃষ্ঠের মোট পরমাণুর প্রায় 8×10^{-7} শতাংশ হচ্ছে থ্যালিয়াম।

1863 সালে জার্মানির ফ্রেইবার্গ (Freiberg) মাইনিং অ্যাকাডেমির পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক এফ. রেইখ (F. Reich) এবং তাঁর সহকারী টি এইচ. রিখটার (Th. Richter) থ্যালিয়াম মৌলের ধর্ম বিশদভাবে অধ্যয়নের জন্য অধিক পরিমাণে ধাতুটি উৎপন্ন করার চেষ্টা করেন এবং হিমেলস্ফুর্স্ট (Himmelsfurst) খনি থেকে পাওয়া জিংকের আকরিকটি বিশ্লেষণ করেন। আকরিকটি ছিল অনেকগুলি মৌলের আকর। জিংক ছাড়াও আকরিকে সালফার, আর্সেনিক, লেড, সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, টিন, ক্যাডমিয়ামের অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল। আকরিকে থ্যালিয়াম পাবার চেষ্টা ব্যর্থ হল কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষায় রেইখ অজ্ঞাত গঠন বিশিষ্ট বিচুলির মতো হলুদ রংয়ের অধঃক্ষেপ পেয়েছিলেন। হলুদ অধঃক্ষেপের বর্ণালি বিশ্লেষণে উজ্জ্বল নীল রেখা সৃষ্টিকারী একটি নূতন মৌল ধরা দিল, যার নামকরণ হল ইন্ডিয়াম। এটি প্রাচুর্যের নিরিখে বিরল মৌলদের একটি বলে গণ্য হয়।

আধুনিক "পর্যায় সারণির" অন্যতম জনক মেন্ডেলেয়েভ জ্ঞাত প্রতিবেশী মৌলদের আচার-আচরণের ভিত্তিতে কিছু কিছু অজ্ঞাত মৌলের আচার-আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং "পর্যায় সারণিতে" তাদের 'স্থান শূন্য রেখেছিলেন। '''পর্যায় সারণির" শূন্যস্থানগুলি রসায়নবিদদের শূন্যস্থান পূরণে প্ররোচিত করছিল। বাস্তবিকই তখনকার সময়ে অজ্ঞাত মৌল

সম্পর্কে মেন্ডেলেয়েভের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল খুব বিস্ময়কর — পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত মৌলদের আচার-আচরণের সঙ্গে যার আশ্চর্যজনক মিল দেখা যায়। মেন্ডেলেয়েভের প্রস্তাবিত অজ্ঞাত মৌল "একা-অ্যালুমিনিয়াম", "একা- বোরন" ও "একা-সিলিকন" পরবর্তী সময়ে যথাক্রমে গ্যালিয়াম, স্ক্যানডিয়াম ও জার্মেনিয়াম নামে আত্মপ্রকাশ করে।

1875 সালে ফ্রান্সের বিজ্ঞানী পি. ই. লেকোক ডি বোইসবাউড্রেন (P. E. Lecoq de Boisbaudran) আর্গেলে উপত্যকার পাইরেনিস (Pyreness) খনি থেকে পাওয়া জিংক ব্লেন্ড খনিজ উপজাত পদার্থের বিশ্লেষণে একটি নূতন মৌলের সন্ধান পান। তিনি মৌলটির নাম ফ্রান্সের প্রাচীন নাম "গ্যালিয়া" (Gallia) অনুসারে গ্যালিয়াম (Gallium) প্রস্তাব করেন। বোইসবাউড্রেন তাঁর গবেষণালব্ধ বিবরণ 1875 সালের 27 আগস্ট "প্যারিস অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস" -এ পেশ করেন। নূতন মৌলটির কিছু কিছু ধর্ম তিনি বর্ণনা করেন এবং উল্লেখ করেন যে মৌলটি বর্ণালি বিশ্লেষণ পরীক্ষায় ধরা দিয়েছে। মেন্ডেলেয়েভ জানালেন যে গ্যালিয়ামই তাঁর বর্ণিত "একা-অ্যালুমিনিয়াম", যদিও বোইসবাউড্রেন প্রথমত মেন্ডেলেয়েভের ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বললেন যে তিনি মেন্ডেলেয়েভের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা জানতেন না।

মেন্ডেলেয়েভের প্রস্তাবিত "একা-অ্যালুমিনিয়াম" এবং বোইসবাউড্রেনের গ্যালিয়ামের ধর্মাবলী এক নজরে সারণি-6 তে দেখে নেওয়া যাক।

সারণি- 6: "একা অ্যালুমিনিয়াম" ও গ্যালিয়ামের ধর্মাবলী

একা-অ্যালুমিনিয়াম, চিহ্ন Ea	**গ্যালিয়াম, চিহ্ন Ga**
পারমাণবিক ভর প্রায় 68। গলনাঙ্ক কম হবে। ঘনত্ব প্রায় 6। পারমাণবিক আয়তন প্রায় 11.5। বাতাসে অবিকৃত থাকবে। ফুটন্ত জলকে বিশ্লিষ্ট করবে। ফিটকারি উৎপন্ন করবে। অক্সাইড (Ea_2O_3) সহজে বিজারিত হয়ে ধাতুতে পরিণত হবে। Ea যথেষ্ট উদ্‌বায়ী হবে এবং বর্ণালি বিশ্লেষণে সাড়া দেবে।	পারমাণবিক ভর 69.72 । গলনাঙ্ক 29.75^0C । ঘনত্ব 5.9। পারমাণবিক আয়তন 11.8। লোহিত তপ্ত অবস্থায় মৃদু জারিত হয়। অধিক তাপমাত্রায় জল বিশ্লিষ্ট করে। ফিটকারি উৎপন্ন করে, সংকেত $NH_4Ga\ (SO_4)_2 .\ 12H_2O$. Ga_2O_3 বিজারিত হয়ে ধাতব গ্যালিয়ামে পরিণত হয়। বর্ণালি বিশ্লেষণের পথ ধরেই গ্যালিয়াম আবিষ্কৃত হয়।

বোইসবাউড্রেনের গবেষণা পত্রে গ্যালিয়ামের কম ঘনত্বের (4.7) উল্লেখ দেখে মেন্ডেলেয়েভ তাঁকে চিঠি লিখে জানান যে সম্ভবত হালকা ধাতু সোডিয়াম অশুদ্ধির উপস্থিতিই গ্যালিয়ামের ঘনত্ব হ্রাসের জন্য দায়ী। তাই গ্যালিয়ামের বিশুদ্ধিকরণ প্রয়োজন। 1876 সালে বোইসব্রাউড্রেন পুনরায় গ্যালিয়ামের ঘনত্ব নির্ণয় করেন। তাঁর নির্নীত গ্যালিয়ামের ঘনত্বের চূড়ান্ত মান (5.9) ছিল মেন্ডেলেয়েভের প্রস্তাবিত মানের (6.0) খুব কাছাকাছি। ঘটনাটি ফ্রান্স বিজ্ঞানীকে মেন্ডেলেয়েভের অজ্ঞাত মৌলের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি খুব আস্থাবান করে তুলেছিল। জানা যায় বোইসবাউড্রেন তাঁর একটি ফটো মেন্ডেলেয়েভকে পাঠান যার পেছনে লেখা ছিল ঃ

"গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে এবং মেন্ডেলেয়েভকে বন্ধু হিসেবে পাবার ব্যাকুল ইচ্ছায় — এল ডি বি।"

ভূপৃষ্ঠের মোট পরমাণুর প্রায় 4×10^{-4} শতাংশ হচ্ছে গ্যালিয়াম। এর পারমাণবিক সংখ্যা 31।

1851 সাল থেকে 1875 সাল পর্যন্ত আমাদের যেসব সদস্য আত্মপ্রকাশ করেছিল তারা হল ঃ সিজিয়াম, রুবিডিয়াম, থ্যালিয়াম, ইন্ডিয়াম ও গ্যালিয়াম।

1868 সালে ফরাসি জ্যোতির্বিদ জে. জেনসেন (J. Janssen) এবং ইংরেজ জ্যোতির্বিদ এন. লকিয়ার (N. Lockyer) বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সূর্যকে বেষ্টনকারী প্রজ্জ্বলিত গ্যাসীয়মণ্ডলের (ক্রোমোস্ফিয়ার, Chromosphere) বর্ণালিতে এক নূতন হলুদ রেখা ধরা পড়ল যা সোডিয়ামের হলুদ রেখা থেকে ছিল ভিন্ন। সোডিয়াম রেখাটি D-রেখা নামে পরিচিত যা 589.3 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্দেশ করে। তোমরা তো জান দৃশ্য আলোক বে-নী-আ-স-হ-ক-লা এই সাতটি রং মেখে শ্বেত শুভ্র রূপ ধারণ করে। আর আলোকের ঝর্নাধারা তরঙ্গের আকারে বয়ে চলেছে। জেনসেন ক্রোমোস্ফিয়ারে ধরা পড়া নূতন রেখাটিকে D_2 রেখা রূপে চিহ্নিত করলেন। লকিয়ার বললেন যে নূতন রেখাটি পৃথিবীর বুকে সেসময় পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া মৌলদের থেকে আলাদা কোনো মৌল নির্দেশ করে। মৌলটির নাম সূর্যের গ্রিক নাম অনুসারে দেওয়া হয়েছিল হিলিয়াম।

পৃথিবীর বুকে আমাদের সদস্যদের তালিকায় ঠাঁই করে নিতে এখানেও হিলিয়ামের দেখা দেওয়া ছিল জরুরি। পৃথিবীর বুকে হিলিয়ামের দেখা পাওয়া গেল, প্রায় 27 বছর পরে, 1895 সালে বিজ্ঞানী র‍্যামজের হাত ধরে। র‍্যামজে ক্লেভাইট (Clevite) খনিজে আত্মগোপন করে থাকা হিলিয়ামকে বের করে আনলেন 1895 সালে। প্রায় একই সময়ে সুইডিশ রসায়নবিদ পি. ক্লেভে (P. Cleve) ও তার সহকর্মী এ. ল্যাংলেট (A. Lunglet) পিচব্লেন্ড গোত্রীয় একটি খনিজে মহাজাগতিক হিলিয়ামের সন্ধান পান। খনিজটির নাম ক্লেভের সম্মানার্থে দেওয়া হয় ক্লেভাইট। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে পৃথিবীর বুকে হিলিয়ামের সন্ধানদাতাদের প্রথম একজন হিসেবে ক্লেভে মর্যাদা পান নি। খেয়াল করলে তোমরা দেখতে পাবে যে কর্মের বিজ্ঞান সময় সময় ভাগ্যের দর্শনে গিয়ে পরিণতি পায়। 1898 সালে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে

হিলিয়াম ধরা পড়ে। ভূগর্ভে বিরাজমান প্রাকৃতিক গ্যাসেও হিলিয়ামের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে।

বিরল মৃত্তিকা মৌল সম্পর্কে বিখ্যাত ফরাসি রসায়নবিদ জি. আর্বেইন (G. Urbain) বলতেন, "বিরল মৃত্তিকা মৌলগুলির ইতিহাস ছিল ভুলের সমুদ্র, যার মধ্যে সব সত্য ডুবে গিয়েছিল।" বস্তুত 1878 সাল থেকে 1910 সাল পর্যন্ত বত্রিশ বছরে বিজ্ঞানিগণ নূতন একুশটি বিরল মৃত্তিকা মৌল পাওয়া গেছে বলে দাবি করলেও বাস্তবে মাত্র দশটির সঙ্গে বিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কোনো খনিজ থেকে বিশুদ্ধ মৌল আহরণ ছিল ভীষণ সমস্যাসংকুল ব্যাপার। তাছাড়া প্রকাশিত ও প্রচারিত নূতন মৌল অনেক ক্ষেত্রেই যথার্থ বিশুদ্ধ ছিল না। বরং পরবর্তী সময়ে নিপুণ বিশ্লেষণে তথাকথিত নূতন মৌলেই আরো নূতন মৌলের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। একে কোনো মৌলের শাখা-প্রশাখা বিস্তারের ঘটনা মনে করতেন কেউ কেউ।

শুরুতে বিরল মৃত্তিকা মৌলের জানা খনিজের সংখ্যা ছিল কম, গ্যাডোলিনাইট, সেরাইট খনিজগুলিও ছিল দুষ্প্রাপ্য। 1878 সালে সুইস রসায়নবিদ জে. ডি. ম্যারিগন্যাক (J. de Marignac) এরবিয়াম বিশ্লেষণ করে নূতন একটি মৌল পৃথক করেন। মূল খনিজ উৎস ইটারবি গ্রামের সম্মানার্থে মৌলটির নাম দেওয়া হয় ইটারবিয়াম। 1879 সালে সুইডিশ রসায়নবিদ এল. নিলসন (L. Nilson) এরবিয়াম থেকে আরো একটি নূতন মৌল পৃথক করেন এবং মৌলটির নাম দেন স্ক্যান্ডিয়াম। একটি নূতন বিরল ধাতু — স্ক্যান্ডিয়াম (On Scandium — a New Rare Metal) শীর্ষক নিলসনের গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয় 1879 সালের 12 মার্চএবং প্যারিস অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর অধিবেশনে পরিবেশিত হয় 24 মার্চ। অজ্ঞাত মৌল 'একা-বোরন' সম্পর্কে মেন্ডেলেয়েভের ভবিষ্যদ্‌বাণী স্ক্যানডিয়ামের ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিপন্ন হয়।

সারণি 7 ঃ "একা-বোরন" ও স্ক্যান্ডিয়ামের ধর্মাবলী

একা-বোরন, চিহ্ন Eb	**স্ক্যান্ডিয়াম, চিহ্ন Sc**
পারমাণবিক ভর প্রায় 44	পারমাণবিক ভর 45.1
ঘনত্ব প্রায় 3.0	ঘনত্ব 3.0
পারমাণবিক আয়তন প্রায় 45	পারমাণবিক আয়তন 45
ধাতুটি অনুদ্‌বায়ী হবে	উদ্‌বায়িতা কম
অধিক তাপমাত্রায় জলকে বিশ্লিষ্ট করবে	ফুটন্ত জলকে বিশ্লিষ্ট করে
ক্ষারকীয় অক্সাইড উৎপন্ন করবে	ক্ষারকীয় অক্সাইড উৎপন্ন করে
অক্সাইড (Eb_2O_3) জলে অদ্রাব্য হবে	অক্সাইড (Sc_2O_3) জলে অদ্রাব্য
ফিটকারি উৎপন্ন করবে, তবে প্রস্তুত করা কঠিন হবে।	দ্বি-লবণ উৎপন্ন করে, সংকেত ঃ $3K_2SO_4 . Sc_2(SO_4)_3$

1879 সালেই ক্লেভে জানালেন যে ইটারবিয়াম ও স্ক্যান্ডিয়াম মুক্ত এরবিয়ামও বিশুদ্ধ ছিল না। ইটারবিয়াম ও স্ক্যান্ডিয়াম মুক্ত এরবিয়ামেই ক্লেভে খুঁজে পেলেন আরো নূতন দুটি মৌল হোলমিয়াম ও থুলিয়াম। ক্লেভে এদের পৃথক করতেও সমর্থ হন।

দু'বছরে ইট্রিয়াম 'গাছ'টি কেমন শাখা-প্রশাখা মেলেছিল তোমরা এক নজরে তা দেখে নিতে পার।
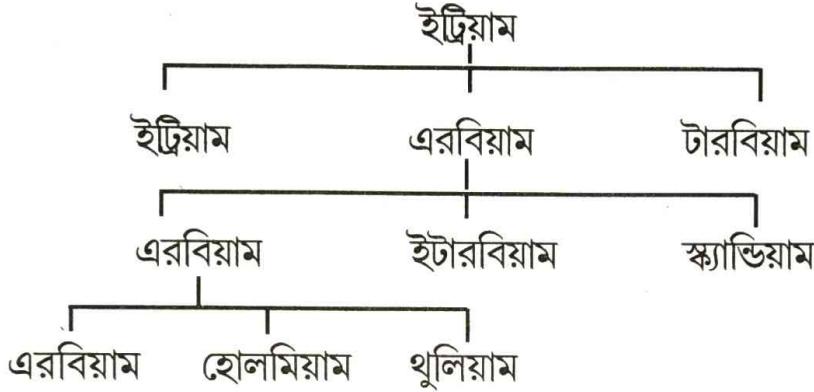
সেরিয়াম নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করে মোসান্ডার জানালেন যে এতে 'ল্যান্থানাম' (La) ও 'ডাইডিমিয়াম' (Di) নামে আরো দুটি নূতন মৌল বর্তমান। মেন্ডেলেয়েভের আদি 'পর্যায় সারণিতে'ও তোমরা এই দুটি মৌলের অবস্থান দেখতে পাবে। পরবর্তী সময়ে প্রকৃতিতে ল্যান্থানামের সন্ধান পাওয়া গেলেও 'ডাইডিমিয়াম', গ্রিক ভাষায় যার অর্থ 'যমজ', ধরা দেয় নি। বলতে পার বিরলমৃত্তিকা মৌলের খেয়ালিপনা এবং একে অপরের সঙ্গে মিশে থাকার প্রবল প্রবণতা রসায়নবিদদের বিভ্রান্ত করে তুলেছিল।

বিরলমৃত্তিকা রসায়নে অস্ট্রিয়ান রসায়নবিদ সি. অউয়ের ভন ওয়েলবাখ (C. Auer von Welsbach) উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন এবং তিনিই প্রথম বিরল মৃত্তিকা মৌলের ব্যবহারিক প্রয়োগের রাস্তা খুলে দেন। 1885 সালে তিনি তথাকথিত 'ডাইডিমিয়াম' থেকে দুটি নূতন মৌল পৃথক করেন। হালকা সবুজ রঙের লবণ তৈরির জন্য তিনি একটি মৌলের নাম দেন প্রাসিয়োডিমিয়াম (Praseodymium), গ্রিকভাষায় যার অর্থ 'সবুজ যমজ' এবং অন্যটির নামকরণ করেন নিয়োডিমিয়াম (Neodymium), গ্রিক ভাষায় যার অর্থ 'নূতন যমজ'। প্রাসিয়োডিমিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা 59, রাসায়নিক চিহ্ন Pr, নিয়োডিমিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা 60, চিহ্ন Nd।

'ডাইডিমিয়ামে'র অশুদ্ধি দূর করে বোইসবাউড্রেনের পাওয়া (1879) নূতন মৌল সামারিয়ামও বিশুদ্ধ ছিল না।

ম্যারিগন্যাক সামারিয়ামকে বহুবার পুনঃকেলাসিত করে দুটি অংশ পান, অংশ দুটিকে তিনি $Y\alpha$ এবং $Y\beta$ হিসেবে চিহ্নিত করেন যাতে ইট্রিয়ামের চিহ্নের (Y) সঙ্গে এদের সংঘাত না বাধে। একটি অংশ ($Y\beta$) সামারিয়াম প্রতিপন্ন হয়। 1886 সালে বোইসবাউড্রেন অন্য

অংশটি (Yα) বিশ্লেষণ করে এটিকে একটি নূতন মৌলের স্বীকৃতি দেন এবং নামকরণ করেন গ্যাডোলিনিয়াম।

হোলমিয়ামের বিশদ বর্ণালিবীক্ষণ দুটি রেখা নির্দেশ করে যা ছিল হোলমিয়ামে আরো একটি নূতন মৌলের উপস্থিতির সূচক। 1886 সালে বোইসবাউড্রেন অনেক কষ্টে, অনেকবার পুনঃকেলাসনের মাধ্যমে নূতন মৌলটিকে পৃথক করেন। অনেক কষ্টের বিনিময়ে খুঁজে পেতে হয়, তাই মৌলটির নাম দেওয়া হয় ডিসপ্রোসিয়াম।

'পর্যায় সারণির' শূন্যস্থান পূরণের লক্ষ্যে 'একা-সিলিকন' নাম দিয়ে মেন্ডেলেয়েভ অনাবিষ্কৃত মৌলটির ধর্মকর্ম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, যেমনটি তিনি আরো একাধিক অজ্ঞাত মৌলের ক্ষেত্রে করেছিলেন।

1885 সালে হিমেলস্‌ফুর্স্ট খনিতে একটি নূতন খনিজের সন্ধান পাওয়া যায় — যার নাম দেওয়া হয় 'আর্জিরোডাইড' কারণ ঐ খনিজে সিলভার অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে উপস্থিত ছিল। আর সিলভারের ল্যাটিন নাম আর্জেন্‌টাম থেকেই খনিজটির 'আর্জিরো ডাইড' নামকরণ হয়। রসায়নবিদ সি. উইনক্লের (C. Winkler) খনিজটি বিশ্লেষণ করে 74.72 শতাংশ সিলভার, 17.43 শতাংশ সালফার, 0.66 শতাংশ আয়রন (II) অক্সাইড, 0.22 শতাংশ জিংক অক্সাইড এবং 0.01 শতাংশ মারকারি পেয়েছিলেন। বার কয় বিশ্লেষণ করেও তিনি এক শো ভাগের হিসাব মিলাতে পারছিলেন না। তিনি ধরে নিলেন যে নূতন কোনো অজ্ঞাত মৌলের উপস্থিতিই 6.96 শতাংশ গরমিলের জন্য দায়ী। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে উইন্‌ক্লের ঐ খনিজ থেকে 1886 সালে নূতন একটি মৌল পৃথক করতে সমর্থ হন। মৌলটির নামকরণ হয় জার্মেনিয়াম। ভবিষ্যদ্‌বাণী করা 'একা-সিলিকনের' ধর্মের সঙ্গে আবিষ্কৃত মৌল জার্মেনিয়ামের ধর্মের যথেষ্ট মিল ধরা পড়ে।

সারণি 8 ঃ 'একা-সিলিকন' ও জার্মেনিয়ামের ধর্মাবলী

একা - সিলিকন, চিহ্ন Es	**জার্মেনিয়াম, চিহ্ন Ge**
পারমাণবিক ভর প্রায় 72	পারমাণবিক ভর 72.6
ঘনত্ব প্রায় 5.5	ঘনত্ব 5.327
পারমাণবিক আয়তন 13	পারমাণবিক আয়তন 13.57
অক্সাইড (EsO_2) মৃদু ক্ষারকীয় হবে	অক্সাইড (GeO_2) উভধর্মী প্রকৃতির
$EsCl_4$ যৌগটি তরল হবে,	$GeCl_4$ যৌগটি তরল,
স্ফুটনাঙ্ক হবে প্রায় 90^oC	স্ফুটনাঙ্ক 83^oC
EsH_4 যৌগটি অস্থায়ী হবে	GeH_4 যৌগটি সহজেই বিয়োজিত হয়
$Es(C_2H_5)_4$ সংকেত বিশিষ্ট জৈব-ধাতব যৌগ প্রস্তুত করা যাবে	$Ge(C_2H_5)_4$ যৌগটি প্রস্তুত করা যায়

হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপটন, জেনন এবং রেডন এই ছটি গ্যাসীয় মৌল প্রকৃতিতে খুবই দুষ্প্রাপ্য। তাই এদের বলা হয় "মহার্ঘ গ্যাস" (Noble Gas)। নিরীহ, নির্লিপ্ত, উদাসীন স্বভাবের জন্য এদের নিষ্ক্রিয় গ্যাস (Inert Gas) হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। এদের স্বভাবের কথা পরে তোমাদের বিশদভাবে বলব। আগে তোমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কীভাবে এদের পরিচয় ঘটল তা জেনে নেওয়া যেতে পারে।

"মহার্ঘ গ্যাস" পরিবারের প্রথম সদস্য হিলিয়ামের দেখা প্রথম মেলে তোমাদের সৌরজগতের মধ্যমণি সূর্যের বহির্মণ্ডলে, ক্রোমোস্ফিয়ারে। পৃথিবীর বুকে হিলিয়ামের সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই বিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল নিষ্ক্রিয় মৌল আর্গনের সঙ্গে।

বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে তাকালে তোমরা দেখতে পাবে যে কোনো কোনো সময় চমকপ্রদ, চাঞ্চল্যকর পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল যেমন নূতন জ্ঞান ভাণ্ডারের দুয়ার খুলে দেয় তেমনি পরীক্ষা লব্ধ ফলের ব্যাখ্যায় এগিয়ে আসা তাত্ত্বিক গবেষণাও বিজ্ঞানকে আরো একধাপ এগিয়ে যাবার পথ দেখায়। মহার্ঘ গ্যাসের ক্ষেত্রেও কতকটা তেমনি ঘটেছে বলতে পার।

1785 সালে ক্যাভেনডিশ বায়ুর উপাদান নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। তিনি একটি বদ্ধ ফ্লাস্কে বায়ু ও অতিরিক্ত অক্সিজেনের মিশ্রণে প্ল্যাটিনাম তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টির ব্যবস্থা করেন। বায়ুর নাইট্রোজেন অতিরিক্ত অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে নাইট্রোজেনের অক্সাইড (N_2O_5) তৈরি করে যা ক্ষারীয় দ্রবণে শোষিত হয়। অতিরিক্ত অক্সিজেনকে পটাশিয়াম পেন্টাসালফাইড দ্রবণে দ্রবীভূত করার পরও ক্যাভেনডিশ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে বায়ুর প্রায় 120 ভাগের 1ভাগ অবিকৃত ও অপরিবর্তিত থেকে যায়। ক্যাভেনডিশ এর সঠিক কারণ দেখাতে না পারলেও বললেন যে বায়ুতে $^1/_{120}$ ভাগের মতো এমন কোনো উপাদান আছে যা নাইট্রোজেন অক্সাইডে পরিণত হয় না। অর্থাৎ বায়ুর প্রায় $^1/_{120}$ অংশ মোটেই মিশুকে প্রকৃতির নয়। ক্যাভেনডিশের এই যুগান্তকারী পর্যবেক্ষণ পরবর্তী এক শতাব্দী ধরে উত্তরসূরী কোনো বিজ্ঞানীর নজরেই এল না। 1894 সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী জে. র‍্যালে (J. Rayleigh) এবং র‍্যামজে নাইট্রোজেন গ্যাসের ঘনত্ব নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে লক্ষ্য করেন যে রাসায়নিক উৎস থেকে পাওয়া নাইট্রোজেনের ওজন প্রতি লিটারে 1.2505 গ্রাম এবং বায়ু থেকে পাওয়া নাইট্রোজেনের ওজন প্রতি লিটারে 1.2572 গ্রাম। তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগল — এ প্রভেদের কারণ কী ? শতাধিক বছর আগে করা পূর্বসূরী ক্যাভেনডিশের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দুই বিজ্ঞানীকে পথ দেখাল। তাঁরা ক্যাভেনডিশের পরীক্ষাটি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং নিঃসন্দেহ হলেন যে বায়ুর অংশ $^1/_{120}$ বাস্তবিকই অবিকৃত থেকে যায় — যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। তাঁরা

সিদ্ধান্তে আসেন যে বায়ুতে নাইট্রোজেন অপেক্ষা ভারী কোনো গ্যাসীয় মৌলের উপস্থিতিই বায়ু থেকে পাওয়া নাইট্রোজেনের বর্ধিত ঘনত্বের কারণ। অর্থাৎ বায়ুর অমিশ্রুকে $^{1}/_{120}$ অংশে নূতন গ্যাসীয় মৌল বর্তমান। আবার প্রশ্ন দেখা দিল — নূতন মৌল বর্তমান — একটি না একাধিক! এবার গবেষণা অজ্ঞাত গ্যাসীয় অংশকে শনাক্তকরণের দিকে মোড় নিল।

র‍্যালে এবং র‍্যামজে বায়ুর বিভিন্ন উপাদান — নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি দূরীভূত করে অবশিষ্ট অংশ নিয়ে পরীক্ষা চালালেন। অজ্ঞাত গ্যাসটির আণবিক ওজন দাঁড়াল 40, গ্যাসটি সর্বতোভাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিপন্ন হল। তপ্ত ধাতু, তপ্ত কপার অক্সাইড, KOH, $KMnO_4$, Na_2O_2 প্রভৃতি কারো সঙ্গেই মিলনে গ্যাসটি আগ্রহ প্রকাশ করল না, এমনকী অতি সক্রিয় ফ্লোরিনের প্রতিও তার কোনো আসক্তি প্রকাশ পেল না। নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির জন্যই র‍্যামজে গ্যাসীয় মৌলটির নাম দিয়েছিলেন আর্গন।

হিলিয়াম ও আর্গনের সঙ্গে পরিচিতির পর র‍্যামজের মনে হল যে 4 আণবিক ওজন বিশিষ্ট হিলিয়াম এবং 40 আণবিক ওজন বিশিষ্ট আর্গন মৌলের মধ্যবর্তী ওজনের কোনো নিষ্ক্রিয় গ্যাস প্রকৃতিতে অবশ্যই বিরাজ করবে। তিনি আরো ভাবলেন যে তাঁদের জানা আর্গন মৌলটি 100 শতাংশ আর্গন নাও হতে পারে। এর মধ্যেই হয়তো আত্মগোপন করে আছে এক বা একাধিক নিষ্ক্রিয় মৌল। তাই নূতন উদ্যমে শুরু হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এগিয়ে এলেন বিজ্ঞানী এম. ডবলু. ট্রেভার্স (M. W. Travers)।

1898 সালে র‍্যামজে ও ট্রেভার্স তরল আর্গনের আংশিক পাতনের ব্যবস্থা করেন। সবচেয়ে কম উষ্ণতায় সংগৃহীত গ্যাসটি বর্ণালিবীক্ষণ পরীক্ষায় একটি নূতন মৌল হিসেবে ধরা দেয়। মৌলটির নামকরণ হল নিয়ন। আর সবচেয়ে বেশি স্ফুটনাঙ্কের অবশেষে আরো দুটি নূতন মৌলের সন্ধান পাওয়া গেল। মৌল দুটির নাম দেওয়া হল ক্রিপ্টন এবং জেনন।

নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি প্রকৃত অর্থেই মহার্ঘ গ্যাস। এদের মোট আয়তন বায়ুর প্রায় 120 ভাগের 1 ভাগ। বলা হয় 100 লিটার বায়ুতে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির আয়তন হল ঃ আর্গন 934 মিলিলিটার, হিলিয়াম 0.52 মিলিলিটার, নিয়ন 1.82 মিলিলিটার, ক্রিপ্টন 0.44 মিলিলিটার এবং জেনন 0.009 মিলিলিটার। কিন্তু এরা সবাই প্রকৃত অর্থেই নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত কিনা আমরা পরে তা খতিয়ে দেখব।

ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়াম প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় মৌল হলেও রাসায়নিক বিশ্লেষণের পথ ধরেই এদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। খনিজে এরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উপস্থিত থাকাতেই বিজ্ঞানীরা খনিজ থেকে এদের মোটামুটি সহজেই উদ্ধার করেন। পোলোনিয়াম, রেডিয়াম, রেডন, অ্যাক্টিনিয়াম, প্রোট্যাক্টিনিয়াম প্রভৃতি প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি প্রাচুর্যের নিরিখে

বিরলতম মৌলদের অন্যতম। তাছাড়া ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের তেজস্ক্রিয় রূপান্তরের পথ ধরেই এদের জন্ম হয়। অর্থাৎ বলতে গেলে ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়ামই এদের উৎস।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের তীব্রতা পরিমাপের মাধ্যমে প্রথম যে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় মৌলের সন্ধান মিলেছিল তার নাম দেওয়া হয়েছিল, মেরি কুরির (Marie Curie) জন্মস্থান পোলান্ডের নামানুসারে পোলোনিয়াম। 1897 সালে মেরি কুরি ও তাঁর স্বামী পিয়েরে কুরি (Pierre Curie) বেকরেল রশ্মি (Becqurel Rays) বা ইউরেনিয়াম রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন। ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের তীব্রতা পরীক্ষা নিরীক্ষায় কুরি দম্পতি বুঝতে পারেন যে ইউরেনিয়াম যৌগের তেজস্ক্রিয়তা সবচেয়ে কম। ধাতব ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা এর চেয়ে বেশি। আর ইউরেনিয়ামের আকরিক পিচব্লেন্ডের তেজস্ক্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। তাঁরা সিদ্ধান্তে আসেন যে পিচব্লেন্ডে এমন একটি নূতন মৌল বর্তমান যার তেজস্ক্রিয়তা ইউরেনিয়ামের চেয়ে বে শি। 1898 সালের 18 জুলাই কুরিদম্পতি প্যারিস অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের এক অধিবেশনে 'পিচব্লেন্ডে অবস্থিত একটি নূতন তেজস্ক্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে' (On a New Radioactive Substance Contained in Pitchblende) একটি বিবৃতিতে পিচব্লেন্ড থেকে অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় গুণ সম্পন্ন, ইউরেনিয়ামের বিকিরিত রশ্মির প্রায় 400 গুণ বেশি তীব্রতা সম্পন্ন, একটি ধাতব যৌগ নিষ্কাশনের ঘোষণা দেন। তাঁরা নূতন মৌলটির নাম প্রস্তাব করেন পোলোনিয়াম। পোলোনিয়ামের অর্ধজীবন কাল বেশি নয় — মাত্র 138 দিন।

আজকাল বিসমাথের উপর নিউট্রন বর্ষণ করেও পোলোনিয়াম তৈরি করা হচ্ছে।

$$^{209}_{83}Bi + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{210}_{83}Bi \rightarrow ^{210}_{84}Po + ^{0}_{-1}e$$

বিসমাথ নিউট্রন পোলোনিয়াম বিটা রশ্মি

পিচব্লেন্ডের ব্যাপক বিশ্লেষণে কুরি দম্পতি ও বিজ্ঞানী জি. বেমন্ট (G. Bemont) সিদ্ধান্তে আসেন যে পোলোনিয়ামের অধিক তেজস্ক্রিয় গুণ সম্পন্ন একটি মৌল পিচব্লেন্ডে বর্তমান। 1898 সালের 26 ডিসেম্বর তাঁরা প্যারিস অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এ 'পিচব্লেন্ডে অবস্থিত অত্যন্ত তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন নূতন একটি পদার্থ সম্বন্ধে' (On a New Highly Radioactive Substance Contained in Pitchblende) তাঁদের গবেষণা লব্ধ ফল পেশ করেন। মৌলটির নামকরণ করা হয় রেডিয়াম। রেডিয়ামের অর্ধ-আয়ুষ্কাল প্রায় 1600 বছর।

তোমরা হয়তো জান যে তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য কুরি দম্পতি বেকরেল সহ 1903 সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কারের জন্য ম্যাডাম কুরিকে 1911 সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত

করা হয়। বস্তুত ম্যাডাম কুরিকে 'রেডিয়াম রমণী' (Radium Lady) বলেও সম্মান জানানো হত। এমনও শোনা যায় যে গবেষণায় নিবেদিত মাদাম কুরি খাওয়া-শোয়া ভুলে গবেষণায় মগ্ন থাকতেন — তাঁর এপ্রনের পকেটে মজুত থাকত রেডিয়াম নমুনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ। প্রথিতযশা বিজ্ঞানী মাদাম কুরি তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মারাত্মক প্রভাবের কথা জানালেন অথচ নিজে এ ব্যাপারে রইলেন উদাসীন। জানা যায় রেডিয়ামের মারাত্মক তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মাদাম কুরির কোমরে ক্ষয় রোগ ধরায় যা পরিণামে রক্তাল্পতা ঘটিয়ে কৃতী বিজ্ঞানীকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়।

পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কারের পর কুরি দম্পতি মনে করতেন যে ইউরেনিয়াম আকরিকে আরো তেজস্ক্রিয় মৌল থাকতে পারে। ম্যাডাম কুরির সহ গবেষক এ. ডেবিয়ের্নে (A. Debierne) কয়েকশো কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম আকরিক নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। আকরিক থেকে ইউরেনিয়াম, পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম নিষ্কাশনের পর তিনি অল্প পরিমাণ অতি সক্রিয়, ইউরেনিয়ামের তুলনায় প্রায় লক্ষগুণ সক্রিয়, একটি পদার্থ পান এবং 1899 সালে তিনি পদার্থটিকে থোরিয়াম সদৃশ একটি নূতন মৌল বলে ঘোষণা করেন। তিনি মৌলটির নামকরণ করেন অ্যাকটিনিয়াম। প্রকৃতপক্ষে নূতন মৌল অ্যাকটিনিয়ামের আচার-আচরণ সম্পর্কে ডেবিয়ের্নের ভাবনায় কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ে। থোরিয়ামের সঙ্গে অ্যাকটিনিয়ামের মিল কমই দেখা যায়। ডেবিয়ের্নে বিশ্বাস করতেন যে অ্যাকটিনিয়াম আলফা-বিকিরক পদার্থ। আসলে অ্যাকটিনিয়াম হল মৃদু বিটা-বিকিরক পদার্থ। অ্যাকটিনিয়ামের আয়ু দীর্ঘ নয়। এর অর্ধ আয়ুষ্কাল 21.6 বছর। বাস্তব ক্ষেত্রে অ্যাকটিনিয়ামের তেজস্ক্রিয় ক্ষয়জাত পদার্থটি ছিল অতি তীব্র তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন ফলে নিজেরই ক্ষয়জাত পদার্থের অতি তীব্র তেজস্ক্রিয়তার আড়ালে পড়া মৃদু তেজস্ক্রিয় বিকিরক অ্যাকটিনিয়ামের যথার্থ শনাক্তকরণ হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত জটিল ব্যাপার।

ধাতব অ্যাকটিনিয়াম নিষ্কাশন করা অনেকদিন সম্ভব হয়ে ওঠে নি। একটন পিচব্লেন্ডে যেখানে মাত্র 400 মিলিগ্রাম রেডিয়ামের সাক্ষাৎ মেলে সেখানে অ্যাকটিনিয়াম থাকে মাত্র 0.15 মিলিগ্রাম। 1953 সালে অ্যাকটিনিয়াম ক্লোরাইডকে ($AcCl_3$) পটাশিয়াম বাষ্পে বিজারিত করে কয়েক মিলিগ্রাম ধাতব অ্যাকটিনিয়াম প্রস্তুত করা হয়।

প্রাকৃতিক প্রথম গ্যাসীয় তেজস্ক্রিয় মৌলের নামকরণ করা হয় রেডন (Radon)। রেডিয়াম ও থোরিয়াম আকরিকের তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের ফলে উৎপন্ন হয় রেডন।

1899 সালে বিজ্ঞানী ই.রাদারফোর্ড ও তাঁর সহগবেষক আর. ওউইনস (R. Owens) থোরিয়াম যৌগের তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা নিরীক্ষায় একটি নূতন তেজস্ক্রিয় গ্যাসের সন্ধান পান

যা রাসায়নিক মিলনে অনাসক্তি প্রকাশ করে। রেডিয়াম যৌগের তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা নিরীক্ষায়ও ঐ গ্যাসের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। জানা যায় যে তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের পথ ধরে 100 গ্রাম রেডিয়াম দিনে প্রায় 2 মিলিলিটার রেডন প্রস্তুত করে। রেডনের সর্বাধিক স্থিতিশীল

$${}^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$$

রেডিয়াম   রেডন   আলফা-কণা

সমস্থানিক ${}^{222}_{86}Rn$ -কে যথার্থ স্থিতিশীল বলা চলে না কারণ এর অর্ধ আয়ুষ্কাল মাত্র 3.8 দিন।

1876 সাল থেকে 1900 সাল পর্যন্ত আমাদের 18 জন সদস্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরিচিত হয়। এরা হল ঃ

ইটারবিয়াম, স্ক্যানডিয়াম, সামারিয়াম, থুলিয়াম, হোলমিয়াম, প্রাসিয়োডিমিয়াম, নিয়োডিমিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াম, জার্মেনিয়াম, আর্গন, হিলিয়াম, নিয়ন, জেনন, পোলোনিয়াম, রেডিয়াম, অ্যাকটিনিয়াম ও রেডন।

ল্যান্থানাইড সারির 63 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌল ইউরোপিয়াম বিরল মৃত্তিকা খনিজে অবস্থান করে। ভূপৃষ্ঠে আপেক্ষিক প্রাচুর্যের তালিকায় ইউরোপিয়ামের স্থান 49। 1901 সালে বিজ্ঞানী ই. ডেমার্কাই-এর কাছে ইউরোপিয়াম ধরা দেয়। বিরল মৃত্তিকা গোষ্ঠীর সর্বাধিক সক্রিয় সদস্য ইউরোপিয়াম জলে অক্সিজেনের বাঁধন থেকে হাইড্রোজেন মুক্ত করে, বিজারিত করে ধাতব অক্সাইড আর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জ্বলে ওঠার প্রবণতা দেখায়।

বিরল মৃত্তিকা রসায়নের উন্নতি সাধনে রসায়নবিদ জি. আরবেইন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন এবং বিরলমৃত্তিকা মৌলগুলির পৃথককরণ পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন করেন। শোনা যায় বিশুদ্ধ অবস্থায় পাবার জন্য আরবেইন থুলিয়াম অক্সাইডকে 15000 বার পুনঃকেলাসিত করেন। 1907 সালে আরবেইন ইটারবিয়াম বিশ্লেষণ করে একটি নূতন মৌল পৃথক করেন যার নামকরণ করা হয় লুটেশিয়াম। "পর্যায় সারণিতে" থোরিয়াম এবং ইউরেনিয়ামের মধ্যবর্তী ঘরটি দীর্ঘদিন খালি ছিল। অনাগত অজ্ঞাত মৌলটিকে "একা ট্যান্টালাম" নাম দিয়ে তার ধর্ম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন মেন্ডেলেয়েভ। 91 সংখ্যক মৌলটি ইউরেনিয়ামের আকরিক পিচব্লেন্ডে অতি অল্প মাত্রায় বর্তমান। মৌলটি এখন প্রোট্যাক্টিনিয়াম (Protactinium) নামে পরিচিত। বলা হয় 1 টন ইউরেনিয়াম আকরিক থেকে মাত্র 340 মিলিগ্রামের মতো প্রোট্যাক্টিনিয়াম নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়েছে।

1913 সালের মার্চ মাসে বিজ্ঞানী কে. ফাজানস্ (K. Fajans) এবং তাঁর সহকারী ও.

গোরিং (O. Goring) ইউরেনিয়াম 238 সমস্থানিকের তেজস্ক্রিয় বিভাজন ক্রিয়ায় 1.14 মিনিট অর্ধায়ু বিশিষ্ট বিটা -কণা নিক্ষেপক একটি নূতন তেজস্ক্রিয় মৌলের সন্ধান পান যার ধর্ম ট্যান্টালামের অনুরূপ। তাঁরা বলেন যে নূতন মৌলটিকে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়ামের মধ্যবর্তী খালি ঘরে স্থান দেওয়া যেতে পারে। তাঁরা নূতন মৌলটির নাম প্রস্তাব করেন "ব্রেভিয়াম" (Brevium) গ্রিক ভাষায় যার অর্থ "ক্ষণ জীবন সম্পন্ন"। বলতে পার ব্রেভিয়ামের মন্দ কপাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠায় তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থের গবেষণার তথ্য আদান প্রদান দারুণভাবে ব্যাহত হয়। ফলে "ব্রেভিয়াম" বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃতি লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

1917-18 সালে একদিকে ইংরেজ বিজ্ঞানী সডি ও তাঁর সহকারী এ. ক্রান্সটন (A. Cranston) এবং অন্যদিকে জার্মান বিজ্ঞানী ও. হ্যান এবং এল. মেইটনার ইউরেনিয়াম 235 সমস্থানিকের তেজস্ক্রিয় বিভাজন ক্রিয়ায় 91 সংখ্যক মৌলের সন্ধান পান। বিজ্ঞানী মহলে ইংরেজ ও জার্মান বিজ্ঞানিগণ 91 সংখ্যক মৌলের সহ আবিষ্কারকের মর্যাদা লাভ করেন। ফাজানস্ মৌলটির সহ আবিষ্কারকের স্বীকৃতি দাবি করেননি তবে তিনি তাঁর আগের দেওয়া "ব্রেভিয়াম" নাম পরিবর্তন করে প্রোট্যাক্টিনিয়াম নামকরণের প্রস্তাব রাখেন।

72 পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট মৌল হ্যাফনিয়াম এবং 75 পরমাণুক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট মৌল রেনিয়াম বিরলতম মৌলদের অন্যতম। ভূপৃষ্ঠে আপেক্ষিক প্রাচুর্যের তালিকায় হ্যাফনিয়ামের স্থান 45 এবং রেনিয়ামের স্থান 76। এদের কণা-মৌল হিসেবে গণ্য করা হয়। এরা ভূত্বকে আকরিক বা খনিজ তৈরি করে না। কিন্তু অন্যান্য মৌলের আকরিকে বা খনিজে এরা অতি অল্প পরিমাণে অশুদ্ধি হিসেবে বিরাজ করে। এর জন্য সমাকৃতিত্ব অর্থাৎ যৌগের কেলাস জালক থেকে কোনো মৌল আয়নকে অন্য মৌল আয়ন দ্বারা প্রতিস্থাপন করার ধর্মই দায়ী। আর মৌলগুলির আয়নিক ব্যাসার্ধ কাছাকাছি হলেই এমন ঘটনা ঘটে। জার্কোনিয়াম এবং হ্যাফনিয়ামের আয়নিক ব্যাসার্ধ প্রায় অভিন্ন, ফলে মৌলদুটির রাসায়নিক সাদৃশ্য এত বেশি যে জার্কোনিয়ামের সঙ্গে অল্প পরিমাণে সচরাচর বিরাজমান হ্যাফনিয়াম বিজ্ঞানীদের কাছে দীর্ঘদিন অধরা ছিল। বস্তুত জার্কোনিয়ামের কবল থেকে হ্যাফনিয়ামকে মুক্ত করা ছিল অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। তাই স্থায়ী মৌল হওয়া সত্ত্বেও এই কণা মৌলদের সন্ধান পেতে বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছিল, বলতে পার।

1923 সালে ডাচ বর্ণালি বিশ্লেষক ডি. কোস্টার (D. Coster) এবং হাঙ্গেরিয়ান তেজস্ক্রিয় রসায়নবিদ জি. হেভেসি (G. Hevesy) জার্কোনিয়ামের খনিজ জারকনে নূতন একটি মৌলের সন্ধান পান আর এই সন্ধান প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় ডেনমার্কে অবস্থিত "দ্য ইনস্টিটিউট অব থিয়োরেটিক্যাল ফিজিক্স অব কোপেনহেগেন ইউনিভারসিটিতে"। জার্কোনিয়ামের কবল

থেকে হ্যাফনিয়ামকে মুক্তি দিতে যে প্রক্রিয়াগুলি প্রয়োগ করা হয় তার মধ্যে নাইট্রেট যৌগের ট্রাইবিউটাইল ফসফেটের সহায়তায় দ্রাবক-নিষ্কাশন (Solvent Extraction) এবং যুগ্ম ক্লোরাইড যৌগের আংশিক কেলাসন (Fractional Crystallization) উল্লেখযোগ্য। কোপেনহেগেনের প্রাচীন নাম অনুসারেই মৌলটির নামকরণ হয় হ্যাফনিয়াম।

তোমরা একটা কথা বলে থাক, "Necessity is the mother of invention" অর্থাৎ প্রয়োজন উদ্ভাবনের জননী। তড়িৎযন্ত্রবিজ্ঞানে টাংস্টেনের ব্যাপক ব্যবহার হয়। বিজ্ঞানিগণ-এর একটা বিকল্প খুঁজে নেওয়া জরুরি বোধ করেন। জার্মান বিজ্ঞানী ডাবলু নোডাক (W Noddack) এবং আই. ট্যাকে (I. Takke) মনে করেন যে 75 পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট অজ্ঞাত মৌলটি টাংস্টেনের যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পারে। কিন্তু মৌলটিকে কোথায় পাওয়া যাবে, কলম্বাইট, প্ল্যাটিনাম আকরিক, ট্যান্টালাইট, উলফ্রেমাইট, গ্যাডোলিনাইট প্রভৃতি খনিজের নাম 75 সংখ্যক মৌলটির উৎসের তালিকায় উঠে এল।

নোডাক, ট্যাকে এবং বর্ণালি বিশ্লেষক ও বার্গ (O. Berg) 1921 সাল থেকে 1925 সাল পর্যন্ত কলম্বাইট ও প্ল্যাটিনাম আকরিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। 1925 সালের জুন মাসে কলম্বাইট ও প্ল্যাটিনাম আকরিকে নূতন মৌল আবিষ্কার সংক্রান্ত তাঁদের একটি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়। মৌলটির নামকরণ হয় রেনিয়াম। প্রকাশিত পরীক্ষালব্ধ ফলের যাথার্থ্য নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নোডাক ও তাঁর সহকর্মীরা 1928 সালে মলিবডেনাইট খনিজ বিশ্লেষণ করে প্রায় 120 মিলিগ্রাম রেনিয়াম প্রস্তুত করেন।

আজকাল অ্যামোনিয়াম পাররেনেট (Ammonium perrhenate, NH_4ReO_4) কে হাইড্রোজেন প্রবাহে উত্তপ্ত করে ধাতব রেনিয়াম প্রস্তুত করা হয়।

$$2NH_4ReO_4 + 4H_2 = 2Re + N_2 + 8H_2O$$
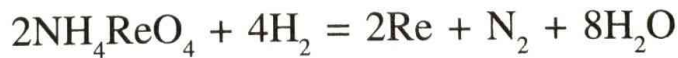
বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেন্ট হিসেবে রেনিয়াম এখন টাংস্টেন অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই বিবেচিত হয়।

1901 সাল থেকে 1925 সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমাদের যে পাঁচ সদস্যের পরিচয় হয়েছিল তারা হল ঃ ইউরোপিয়াম, লুটেশিয়াম, প্রোট্যাক্টিনিয়াম, হ্যাফনিয়াম এবং রেনিয়াম।

প্রকৃতির কোলের সর্বশেষ মৌল রেনিয়াম আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন যে "পর্যায় সারণির", 1 নম্বর মৌল হাইড্রোজেন এবং 92 নম্বর মৌল ইউরেনিয়ামের মধ্যে 43, 61, 85 এবং 87 সংখ্যক মৌল চারটিকে প্রকৃতিতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

"পর্যায় সারণির" পঞ্চম পর্যায়ের এবং সপ্তম শ্রেণীর অন্তর্গত 43 সংখ্যক অজ্ঞাত মৌলটিকে

"একা-ম্যাঙ্গানিজ" নাম দিয়ে তার ধর্মাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করার চেষ্টা করেছিলেন মেন্ডেলেয়েভ। মৌলটির সন্ধান মিলেছে বলেও বিজ্ঞানীমহলে মাঝে মধ্যে কথা চালাচালি হত। 1925 সালের 5 সেপ্টেম্বর ডাবলু. নোডাক, আই. ট্যাকে এবং ও বার্গ 75 সংখ্যক মৌল রেনিয়ামের সঙ্গে তার সমধর্মী হালকা একটি নূতন মৌল আবিষ্কারের ঘোষণা করেন। নূতন মৌলটির নামকরণ করেন "ম্যাসুরিয়াম" (Masurium), প্রুসিয়ার প্রাচীন নাম অনুসারে। তাঁরা দাবি করেন যে প্ল্যাটিনাম আকরিক, কলম্বাইট, গ্যাডোলিনাইট, ট্যান্টালাইট প্রভৃতি খনিজের এক্স-রে বর্ণালি বীক্ষণের মাধ্যমে মৌলটিকে সনাক্ত করেছেন। কিছু কিছু বিজ্ঞান পত্রিকায় এবং রসায়নের পাঠ্য পুস্তকে 43 সংখ্যক মৌলটি "ম্যাসুরিয়াম" নামে (চিহ্ন Ma) আত্মপ্রকাশ করেছিল।

পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন খনিজ ব্যাপক ভাবে বিশ্লেষণ করেও প্রকৃতিতে 43 সংখ্যক মৌলের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বিজ্ঞানিগণ সমর্থ হননি। তোমরা হয়তো জান যে একটি বিজ্ঞান গবেষণা সফল ও সার্থক বিবেচিত হয় তখনই যখন অনুরূপ শর্ত অবলম্বন করে সম্পাদিত পরীক্ষা নিরীক্ষা অনুরূপ ফল (Reproducible Results) প্রকাশ করে। "ম্যাসুরিয়ামের" জন্মবার্তা তাই সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারল না।

সমভার সম্পন্ন বিভিন্ন মৌলের পরমাণুকে বলা হয় আইসোবার (Isobar)। যেমন পটাশিয়াম 40 (40_K) এবং আর্গন 40 (40_A) আইসোবার। পটাশিয়ামের কেন্দ্রকে আছে 19 টি প্রোটন এবং 21টি নিউট্রন। আর আর্গনের কেন্দ্রকে আছে 20টি প্রোটন এবং 20টি নিউট্রন। উভয়েরই ভরসংখ্যা 40।

জার্মান তাত্ত্বিক পদার্থবিদ জে. ম্যাটাউখ (J. Mattauch) বললেন যে যদি দুটি আইসোবারের মধ্যে আধানের পার্থক্য এক হয় তাহলে দুটির মধ্যে একটি অবশ্যই তেজস্ক্রিয় মৌল হবে। আর মৌলটির অর্ধ-আয়ুষ্কালই তার আয়ুর জোর কত তা জানিয়ে দেবে। 40_K এবং 40_A আইসোবার জোড়ার মধ্যে প্রথমটি মৃদু তেজস্ক্রিয়। ম্যাটাউখ বলতে চাইলেন যে 43 সংখ্যক "ম্যাসুরিয়াম" নামক মৌলটি হবে তেজস্ক্রিয় এবং এর সমস্থানিকগুলি সুস্থিত হবে না। অর্থাৎ স্থায়ী মৌলের বিশাল সমুদ্রে ছোটো অস্থায়ী মৌলদ্বীপের অস্তিত্বের ভাবনা বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলল।

খেয়াল করলে তোমরা দেখতে পাবে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা নূতন আবিষ্কারের দুয়ার খুলে দিতে বরাবরই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে কৃত্রিম কেন্দ্রকীয় রূপান্তর বিক্রিয়ার গবেষণা অনেকটা গতি পেয়েছিল। বলতে পার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই. লরেন্স ও তাঁর সহকর্মীদের

উদ্ভাবিত যন্ত্র "সাইক্লোট্রন" এই প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। সাইক্লোট্রন হল ত্বরণযুক্ত আহিত (ধনাত্মক) কণা স্রোতের নিক্ষেপক যন্ত্র বিশেষ। উদ্দেশ্য হল লক্ষ্য বস্তুর উপর ত্বরণযুক্ত আহিত কণা বর্ষণ করে কেন্দ্রকীয় রূপান্তর বিক্রিয়া সংঘটিত করা। এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত উচ্চ তাপ সহন করার জন্য যন্ত্রটিতে দুর্গল মলিবডেনাম পাত ব্যবহার করা হয়। আহিত কণা স্রোতের আঘাতে যন্ত্রে ব্যবহৃত মলিবডেনাম পাতের পরিণতি 43 সংখ্যক মৌলের জন্মদানে প্রেরণা যুগিয়েছিল বলা যায়।

1936 সালে ইটালিয়ান পদার্থবিদ ই. সেগ্রে (E. Segre) স্নাতকোত্তর গবেষণা সম্পাদনের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং বিশ্বের অন্যতম প্রথম সাইক্লোট্রন যন্ত্রটি নিয়ে গবেষণা চালানোর সুযোগ পান। সেগ্রে বুঝতে পারেন যে সাইক্লোট্রন যন্ত্রে ব্যবহৃত মলিবডেনাম পাত আহিত কণার আঘাতে মৌলান্তরিত হয়ে নূতন মৌলে পরিণত হয়েছে। তিনি মনে করেন যে মৌলটি সম্ভবত, অনেক বিজ্ঞানীর কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও প্রকৃতির কোলে না পাওয়া, বিজ্ঞানীদের ঘুম কেড়ে নেওয়া 43 সংখ্যক মৌল "ম্যাসুরিয়াম"।

1937 সালে সেগ্রে ও তাঁর সহ গবেষক সি. পেরিয়ের (C. Perrier) মলিবডেনাম 96 লক্ষ্য বস্তুর উপর ডয়টেরণ বর্ষণ করে 88 দিন অর্ধায়ু বিশিষ্ট একটি মৌল প্রস্তুত করেন। মৌলটির নামকরণ করা হয় টেকনেশিয়াম, কারণ এটিই প্রথম প্রাকৃতিক মৌল, কৃত্রিম পথ ধরে যার ঠিকানায় পৌঁছোতে হয়েছিল।

$$ {}^{96}_{42}\mathrm{Mo} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{97}_{43}\mathrm{T_c} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} $$

মলিবডেনাম ডয়টেরণ টেকনেশিয়াম নিউট্রন
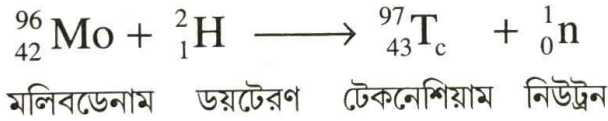
1939 সালে সিবর্গ ও সেগ্রে মলিবডেনাম- 98 সমস্থানিক লক্ষ্যবস্তুর উপর ধীরগতি সম্পন্ন নিউট্রন বর্ষণ করে Tc – 99 সমস্থানিক প্রস্তুত করেন যার অর্ধ-আয়ুষ্কাল 5×10^5 বছর।

$$ {}^{98}_{42}\mathrm{M_o} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \longrightarrow {}^{99}_{42}\mathrm{M_o} \longrightarrow {}^{99}_{43}\mathrm{T_c} + {}^{\mathrm{O}}_{-1}\mathrm{e} $$
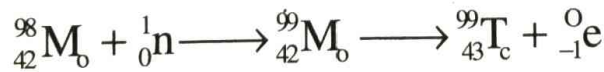
1940 সালে সেগ্রে তাঁর গবেষণাগারে ইউরেনিয়াম বিভাজনজাত পদার্থগুলির মধ্যে 99 ভরসংখ্যা বিশিষ্ট টেকনেশিয়াম সমস্থানিক খুঁজে পান। বিভাজন রিঅ্যাক্টরে (বৃহদায়তন পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন যন্ত্র) টেকনেশিয়াম 99 সমস্থানিক উৎপাদন শুরু হয়। বলা হয় একগ্রাম ইউরেনিয়াম 235 বিভাজনের মাধ্যমে 26 মিলিগ্রাম টেকনেশিয়াম 99 সমস্থানিক উৎপন্ন করে। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই গেল। প্রকৃতির কোলে কি টেকনেশিয়ামের দেখা পাওয়া যাবে না! হাল ছেড়ে দিতে রাজি নন বিজ্ঞানিগণ। তাঁরা মলিবডেনাম আকরিক তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন কিন্তু টেকনেশিয়ামের দেখা পেলেন না। শুরু হল ইউরেনিয়াম উৎসের ব্যাপক

অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ। আমেরিকার রসায়নবিদ বি. কেন্নে (B. Kenne) এবং পি. কুরোডা (P. Kuroda) 1961 সালে ইউরেনিয়াম খনিজেই টেকনেশিয়ামের সন্ধান পেলেন। প্রত্যয়ের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ বললেন যে প্রাকৃতিক টেকনেশিয়ামকে, দেরীতে হলেও, একদিন আত্মপ্রকাশ করতেই হত। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যায় যে 1951 সালে আমেরিকান জ্যোতির্বিদ এস. মোর (S. Moore) সৌর বর্ণালিতে টেকনেশিয়ামের বৈশিষ্ট্য সূচক রেখা প্রত্যক্ষ করেন।

61 সংখ্যক মৌলটিকে ঘিরে দুদশকেরও বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানী মহলে বিতর্ক বিবাদ বিসংবাদ চলছিল বলতে পার। 1926 সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকার ইলিনোয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ.জে. হ্যারিস (J. Harris), এল. ইনটেমা (L. Yntema) এবং বি. হপকিন্স (B. Hopkins) বর্ণালি বীক্ষণের ভিত্তিতে নিয়োডিমিয়াম এবং সামারিয়াম লবণে 61 সংখ্যক মৌলের অস্তিত্বের ঘোষণা করেন। ইলিনোয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানার্থে তাঁরা মৌলটির নামকরণ করেন ইলিনিয়াম (Illinium, চিহ্ন Il)। আর তখন থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। "পর্যায় সারণির" 61 নম্বর ঘরটিতে ইলিনিয়ামের ঠাঁই হল। একদিকে বিজ্ঞানীমহলের একটি অংশ অধরা মৌলটিকে ধরার জন্য হ্যারিস ও তাঁর সহকর্মীদের অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন, অন্যদিকে বিজ্ঞানী প্রান্ডটল (Prandtl) এবং তাঁর সহ গবেষকগণ হ্যারিস গোষ্ঠীর ইলিনিয়াম প্রাপ্তির যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। গভীর সতর্কতার সঙ্গে গবেষণা চালিয়েও তাঁরা ইলিনিয়ামের দেখা পেলেন না। ইলিনিয়ামের জন্মবার্তা প্রকাশের পর ছয়মাস না কাটতেই "পর্যায় সারণির" 61 নম্বর ঘরের নূতন এক দাবিদার আত্মপ্রকাশ করল। ইতালির ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী এল. রোলা (L. Rolla) এবং এল. ফার্নান্ডিস (L. Fernandes) 61 সংখ্যক মৌলটি আবিষ্কারের পাল্টা দাবি করলেন। তাঁরা বললেন যে 1924 সালেই তাঁরা মৌলটি আবিষ্কার করেন এবং ফ্লোরেন্স শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানার্থে মৌলটির নাম প্রস্তাব করেন ফ্লোরেন্সিয়াম (Florentium, চিহ্ন Fl)। তাঁরা আরো জানালেন যে তাঁদের আবিষ্কারের বার্তা প্রকাশিতনা হলেও আবিষ্কারের বিষয়টি ফ্লোরেন্স অ্যাকাডেমির নিরাপদ রক্ষণাগারে সীলমোহরযুক্ত বন্ধ খামে লিপিবদ্ধ ছিল।

ইলিনোয়েস ও ফ্লোরেন্স গোষ্ঠী-দ্বয়ের মধ্যে 61 সংখ্যক মৌলটি আবিষ্কারের অগ্রাধিকারের দাবি ক্রমশ যেন আবশ্যকতা হারাতে বসল। 1926 সালের নভেম্বর মাসে 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মেন্ডেলেয়েভের বন্ধু এবং বিরলমৃত্তিকা রসায়নে পারদর্শী বিজ্ঞানী বোগুস্লাভ ব্রাউনের (Boguslav Brauner) উল্লেখ করেন যে কোনো একটি নূতন মৌলের আবিষ্কার একটি প্রকৌশলগত ব্যাপার — যা শনাক্তকরণ পদ্ধতির উন্নয়নের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রকৃত পক্ষে 61 সংখ্যক মৌলটির অস্তিত্বের ঘোষণাই ছিল বেশি অর্থবহ, বেশি জরুরি, যা তিনি 1902 সালেই করেছিলেন।

একাধিক বিজ্ঞানী বিভিন্ন খনিজে 61 সংখ্যক মৌলটিকে খুঁজে পাবার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলেন। টেকনেশিয়ামের কথা মনে করে কেন্দ্রকীয় বিক্রিয়ার পথ ধরে 61 সংখ্যক মৌলের ঠিকানায় পৌঁছোতে সচেষ্ট হলেন বিজ্ঞানীরা।

1938 সাল থেকে 1942 সাল পর্যন্ত গবেষণা চালিয়ে ওহিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানিগণ এইচ. বি. ল (H. B. Law), এম. এল. পোল (M. L. Pool), জে. ডি. কুর্বাটভ (J. D. Kurbatov) এবং এল. এল. কুইল (L. L. Quill) জানালেন যে নিয়োডিমিয়াম এবং প্রাসিয়োডিমিয়াম লক্ষ্য বস্তুর উপর নিউট্রন, প্রোটন, ডয়টেরন এবং আলফাকণা বর্ষণজাত পদার্থে 61 সংখ্যক মৌলের সমস্থানিক বর্তমান। যেহেতু সাইক্লোট্রন যন্ত্রের সহায়তায় গবেষণাটি সম্পাদিত হয় তাই বিজ্ঞানী পোল এবং কুইল মৌলটির নাম প্রস্তাব করেন সাইক্লোনিয়াম (Cyclonium, চিহ্ন Cy)। তেজস্ক্রিয় সংকেতের মাধ্যমে সাইক্লোনিয়ামের অস্তিত্বের পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেলেও মৌলটির কণা পরিমাণও চোখে দেখা যায়নি। তাই "পর্যায় সারণির" 61 নম্বর ঘরে সাইক্লোনিয়াম ঠাঁই করে নিল বলা যায় না ।

1947 সালে আমেরিকান রসায়নবিদ জে. মেরিনস্কি (J. Marinsky), এল. গ্লেন্ডেনিন (L. Glendenin) এবং সি কোরিয়েল (C. Coryell) একটি নূতন প্রকৌশল "আয়ন বিনিময়কারী ক্রোমাটোগ্রাফী" (Ion-exchange chromatography) প্রয়োগ করে ইউরেনিয়ামের বিভাজিত পদার্থ থেকে 61 সংখ্যক মৌলটি পৃথক করতে এবং শনাক্ত করতে সমর্থ হন। অবশেষে পর্যায় সারণির 61 নম্বর ঘরের প্রকৃত দাবিদারের সাক্ষাৎ মিলল বলা যায়। মৌলটির নামকরণ হল গ্রিক পুরাণের প্রোমেথিউসের নামানুসারে প্রোমেথিয়াম। কথিত আছে প্রোমেথিউস মর্ত্ত বাসীদের ব্যবহারের জন্য স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনেছিলেন।

বর্তমানে নিউট্রনের আঘাতে নিয়োডিমিয়াম 144 থেকে প্রাপ্ত নিয়োডিমিয়াম 145 সমস্থানিক বিটা ভাঙনের মাধ্যমে প্রোমেথিয়াম তৈরি করছে।

$$^{144}_{60}\text{Nd} + {}^{1}_{0}\text{n} \longrightarrow {}^{145}_{60}\text{Nd} \longrightarrow {}^{145}_{61}\text{Pm} + \text{e}$$
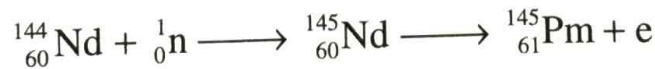
প্রোমেথিয়ামের জানা 15টি সমস্থানিকের মধ্যে সর্বাধিক দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট সমস্থানিকটির অর্ধায়ু মাত্র ত্রিশ বছর। পৃথিবীর বুকে প্রোমেথিয়ামকে খুঁজে পেতে নূতন উদ্যমে বিজ্ঞানীরা প্রচেষ্টা চালালেন। প্রাকৃতিক টেকনেশিয়ামের আবিষ্কর্তা কুরোডা ও তাঁর সহকর্মিগণ 1968 সালে ইউরেনিয়াম আকরিক পিচ ব্লেন্ডে 147 ভর সংখ্যা বিশিষ্ট প্রাকৃতিক প্রোমেথিয়াম সমস্থানিক আবিষ্কার করেন।

1925 সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী ডবলু. ফ্রেন্ড (W. Friend) প্যালেস্টাইনের মরুসাগর থেকে অধিক ঘনত্ব বিশিষ্ট জল সংগ্রহ করেন। উদ্দেশ্য ঐ জলে 85 সংখ্যক অজ্ঞাত মৌল "একা-আয়োডিন" এবং 87 সংখ্যক অজ্ঞাত মৌল "একা সিজিয়াম" কে খুঁজে দেখা। ঐ প্রচেষ্টা সফল হয়নি। "একা আয়োডিন" বা "একা সিজিয়ামের" দেখা মেলে নি। 85 সংখ্যক মৌলটিকে "হ্যালোজেন পরিবারের" সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়। "হ্যালোজেনের" প্রাকৃতিক উৎসে এর সন্ধান প্রক্রিয়া ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তেজস্ক্রিয় প্রকৃতি বিবেচনায় "তেজস্ক্রিয় পরিবারে"ও -এর খোঁজ খবর চলে, কিন্তু উৎসাহজনক কোনো বার্তা মেলে নি।

1929 সাল থেকে 1932 সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানী এফ. অ্যালিসন (F. Allison) ও তাঁর সহকর্মীরা প্রকৃতিতে 85 এবং 87 সংখ্যক মৌল দুটি খুঁজে পেতে ব্যাপক অনুসন্ধান চালান। " ম্যাগনেটো অপটিক" (Magneto Optic) পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁরা লেপিডোলাইট (Lepidolite) এবং পলুসাইট (Pollucite) আকরিকে 85 সংখ্যক এবং 87 সংখ্যক মৌলদুটিকে ধরতে পেরেছেন বলে দাবি করেন। তাঁরা আলাবামা (Alabama) প্রদেশের সম্মানার্থে 85 সংখ্যক মৌলটির নামকরণ করেন আলাবামাইন (Alabamine) এবং 87 সংখ্যক মৌলটির নামকরণ করেন, ভার্জিনিয়া (Virginia) প্রদেশের সম্মানার্থে ভার্জিনিয়াম (Virginium)। অবশ্য বিজ্ঞানী মহলে অ্যালিসন গোষ্ঠীর বক্তব্য সমর্থন পায় নি।

1940 সালে বার্কেলেতে কর্মরত বিজ্ঞানী ডি. করসন (D. Corson), সি. ম্যাকেঞ্জি (C. Mackenzie) এবং ই. সেগ্রে (E. Segre) সাইক্লোট্রনের মাধ্যমে বিসমাথ লক্ষ্য বস্তুর উপর উচ্চ শক্তি সম্পন্ন আলফা কণা বর্ষণ করে 7.5 ঘণ্টা অর্ধায়ু বিশিষ্ট 85 সংখ্যক মৌলের একটি সমস্থানিক প্রস্তুত করেন। তাঁরা মৌলটির নামকরণ করেন অ্যাস্টাটিন।

$$^{209}_{83}\mathrm{Bi} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow {}^{211}_{85}\mathrm{At} + 2\,^{1}_{0}\mathrm{n}$$

অ্যাস্টাটিনের 18টি জানা সমস্থানিকের মধ্যে সর্বাধিক দীর্ঘায়ু বিশিষ্ট সমস্থানিকটির অর্ধায়ু মাত্র 8.3 ঘণ্টা।

1943 সালে ভিয়েনা রেডিয়াম ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী বি. কার্লিক (B. Karlik) এবং টি. বার্নেট (T. Bernet) প্রকৃতির কোলে অ্যাস্টাটিনের সন্ধান পান।

1939 সালের 9 জানুয়ারি ফরাসি বিজ্ঞানী এম. পেরেই (M. Perey) এর "এলিমেন্ট-87; Ack ফর্মড অ্যাকটিনিয়াম" (Element-87; Ack Formed Actinium) শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র প্যারিস অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের পরিচালনায় প্রকাশিত হয়। পেরেই জানালেন যে অ্যাকটিনিয়াম 227 আলফা ভাঙনের মাধ্যমে মাত্র 21 মিনিট অর্ধায়ু বিশিষ্ট

87 সংখ্যক মৌলের 223 ভরসংখ্যার সমস্থানিকে পরিণত হয়। মৌলটি সিজিয়ামের অনুরূপ ধর্মের অধিকারী। নিজের দেশের সম্মানার্থে বিজ্ঞানী মৌলটির নামকরণ করেন ফ্রান্সিয়াম।

$$^{227}_{89}Ac \longrightarrow ^{223}_{87}Fr + ^{4}_{2}He$$
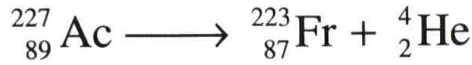
উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে প্রাকৃতিক মৌল হিসেবে গণ্য হলেও ভূপৃষ্ঠে উপস্থিতির প্রাচুর্যের তালিকায় টেকনেশিয়াম, প্রোমেথিয়াম, অ্যাস্টাটিন এবং ফ্রান্সিয়াম স্থান করে নিতে পারেনি।

প্রকৃতিতে বিরাজমান আমাদের 92টি সদস্যদের সঙ্গেই তোমাদের পরিচয় পর্ব সম্পন্ন হল। আমাদের সদস্যদের মধ্যে 70টি ধাতু, 22টি অধাতু। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফ্লোরিন, নিয়ন, ক্লোরিন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন, রেডন এই এগারটি মৌল গ্যাসীয়, এরা অধাতু গোষ্ঠীর অন্তর্গত। মাত্র দুটি মৌল — ধাতব মৌল মারকারি এবং অধাতব মৌল ব্রোমিন তরল প্রকৃতির। বাকীরা কঠিন চরিত্রের। এর মধ্যে বোরন, কার্বন, সিলিকন, ফসফরাস, সালফার, আর্সেনিক, সেলেনিয়াম, টেলুরিয়াম, আয়োডিন এবং অ্যাস্টাটিন এই দশটি মৌল অধাতু এবং বাকি উনসত্তরটি মৌল ধাতু। সিজিয়াম (গলনাঙ্ক + 28°C) এবং গ্যালিয়াম (গলনাংক + 30°C) নিম্ন গলনাঙ্ক বিশিষ্ট ধাতু। ফলে এরা সহসা তরল অবস্থা ধারণ করে।

ওজনের ভিত্তিতে শতাংশ বিচারে তোমাদের দেহে আছে 65.0 শতাংশ অক্সিজেন, 18.5 শতাংশ কার্বন, 9.5 শতাংশ হাইড্রোজেন, 3.3 শতাংশ নাইট্রোজেন, 1.5 শতাংশ ক্যালসিয়াম, 0.3 শতাংশ সালফার, 0.2 শতাংশ সোডিয়াম, 0.1 শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম, আছে অল্প পরিমাণে আয়রন, ফসফরাস, পটাশিয়াম আয়োডিন।

পৃথিবীর স্থলমণ্ডল, জলমণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডলে জুড়ে থাকা মৌলগুলির প্রাচুর্যের চিত্র তোমরা একনজরে সারণি 9 এ দেখে নিতে পার।

সারণি 9 ঃ ওজনের ভিত্তিতে শতাংশ বিচারে প্রকৃতিতে (স্থলে, জলে, বায়ুতে) বিভিন্ন মৌলের প্রাচুর্য।

মৌল	শতাংশ (ওজনের ভিত্তিতে)	মৌল	শতাংশ (ওজনের ভিত্তিতে)
অক্সিজেন	48.6	সিলিকন	26.3
অ্যালুমিনিয়াম	7.53	আয়রন	4.75
ক্যালসিয়াম	3.45	সোডিয়াম	2.74
পটাশিয়াম	2.47	ম্যাগনেশিয়াম	2.00

হাইড্রোজেন	0.76	টাইটানিয়াম	0.42
ক্লোরিন	0.14	ফসফরাস	0.11
কার্বন	0.087	ম্যাঙ্গানিজ	0.085
ফ্লোরিন	0.072	সালফার	0.048
বেরিয়াম	0.040	নাইট্রোজেন	0.030
রুবিডিয়াম	0.028	জার্কোনিয়াম	0.020
ক্রোমিয়াম	0.018	স্ট্রনশিয়াম	0.015
ভ্যানাডিয়াম	0.015	নিকেল	0.010
জিংক	0.008	কপার	0.007
লিথিয়াম	0.0065	সেরিয়াম	0.004
কোবাল্ট	0.004	টিন	0.004
অন্যান্য মৌল ঃ 0.03 শতাংশ			

বস্তুত সারণি 9-এ উল্লিখিত প্রথম 12টি মৌলই প্রকৃতির 99 শতাংশেরও বেশি জুড়ে আছে। আর বাকি অংশ জুড়ে আছে 80টি মৌল।

আমাদের ধর্মকর্মের কথা তোমরা শুনতে চাও। আমাদের ধর্মকর্মের সব কথা বলতে গেলে তা এক মহা- মহাভারত হয়ে উঠবে। তোমাদের তাই আমাদের মৌলিক পদার্থের মৌলিক ধর্ম কথাই শুনাব।

চলায়, বলায়, ভঙ্গিমায়, নাচে, গানে, কবিতায় নিজেদের প্রচার করতে তোমরা যেখানে সতত সচেতন, সক্রিয় সেখানে আমরা ছিলাম নির্লিপ্ত এবং নিরপেক্ষ। তাই আমাদের কথা অনেকেরই হৃদয়ে পৌঁছোয় না।

তোমাদের পছন্দ আছে, অপছন্দ আছে। চাপ এলে, চাপ সে যেরকমই হোক— মানসিক, শারীরিক, আর্থিক, তোমরা তা এড়াতে চাও, চাপ থেকে মুক্তির পথ খোঁজ— তাইতো ! আমাদের কি পছন্দ-অপছন্দ নেই! আমরাও কি বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে প্রয়াসী হই না!

তোমাদের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করে দেখালেন গাছেরও প্রাণ আছে। তার আগে তো মানুষ এ সত্যটাই জানত না। অবশ্য ভারতে বিভিন্ন গাছকে আরাধনা করার রেওয়াজ

ছিল, এখনো আছে। জগদীশচন্দ্র বসু তো আরো জানালেন যে ধাতুরও প্রাণ আছে কারণ তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সাড়া দেয়। তিনি বলতে চাইলেন যে গাছের কথা, মনুষ্যেতর পশুপাখির কথা উপলব্ধি করতে হলে এদের ভালোবাসতে হবে। আর ভালোবাসতে পারলেই এদের হৃদয়ের কথা জানা যায়, শোনা যায়। বাস্তবিকই ভালোবাসলেই যেন হৃদয়ের দুয়ার খুলে যায়। তোমাদের বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক দেহমন উজাড় করে ভালবাসতে পারেন বলেই তো সৃষ্টিরহস্য উন্মোচনের, প্রকৃতির মায়াজাল উদঘাটনের বার্তা শুনতে পান, শোনাতে পারেন। তাঁরা আঁধারের রূপ দেখতে পান, রাজপথের কথা, ঘাটের কথা শোনেন, পায়ে চলার পথও তাঁদের মনোযোগ এড়ায় না। মেঘকে দূত করে বিরহিণী প্রিয়তমার কাছে অভিশপ্ত স্বামীর বার্তা পাঠাতেও প্রকৃতিপ্রেমী কবির কিছুমাত্র আটকায় না। গাছ থেকে ভূমিতে আপেলের পতন বিজ্ঞানীকে কারণ খুঁজতে অনুপ্রেরণা যোগায়। আকাশের রং, ফুল, ফল, প্রজাপতির রং, বাদ্যযন্ত্রের তান বিজ্ঞানীকে আকৃষ্ট করে। আরো কত কী !

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু গাছের প্রাণের কথা বললেন, ধাতুর প্রাণের কথা বললেন। আমাদের অধাতু সদস্যরা বিজ্ঞানীর নজর এড়িয়ে গেল। তোমাদের শাস্ত্রকারেরা বোধহয় অনুভূতির জগৎকে আরো প্রসারিত করতে চাইলেন, বললেন, "সর্বভূতে ঈশ্বর বিরাজমান।" তাঁদের "সর্বভূতে" আমরা আছি কিনা জানি না। তবে আমরাও ভালোবাসতে জানি, আমাদেরও পছন্দ-অপছন্দ আছে। আমরাও চাপমুক্ত হতে প্রয়াসী হই। আমাদের ভালোবাসতে পারলেই আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন তোমরা অনুভব করতে পারবে। তোমাদের রসায়নবিদ গণ অবশ্য আমাদের ভালোবাসেন। আর ভালোবাসা পেলেই আমাদের মেলে ধরতে ইচ্ছা হয়, তোমাদের কবির মতো বলতে ইচ্ছে করে ঃ

"আজি হৃদয় দুয়ার খোলা,
এসো হে এসো হে।"

আমাদের ধর্ম-কর্ম, আচার-আচরণের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য খুঁজে পেতে তৎপর হলেন রসায়নবিদ গণ। আর এর ভিত্তিতেই তাঁরা আমাদের শ্রেণিভুক্ত করার, পর্যায়ভুক্ত করার উদ্যোগ নিলেন। বহুবার তোমাদের বলা 'পর্যায়সারণিতে" রসায়নবিদদের এই উদ্যোগই বাস্তব রূপ পেয়েছে। আমাদের ধর্মকর্মের নিরিখে পর্যায় সারণিতে আমাদের স্থান চিহ্নিত করা হল। বর্তমান পর্যায় সারণির দিকে তাকালে মনে হতেই পারে যে বিজ্ঞানিগণ বহুকক্ষ বিশিষ্ট অট্টালিকা গড়ে আমাদের আচার-আচরণ, মান-মর্যাদা বিবেচনায় আমাদের এক-একজন সদস্যকে এক একটি বৈশিষ্ট্য সূচক কক্ষ বরাদ্দ করার চেষ্টা করেছেন। আর এ ব্যাপারে প্রথম নির্ভরযোগ্য অবদান রাখেন রাশিয়ান রসায়নবিদ মেন্ডেলেয়েভ 1869 সালে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের শ্রেণিবিন্যাসের ভাবনা বহু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। 1817 সালেই-এর পরিচয় পাওয়া

যায় জার্মান রসায়নবিদ ডোবেরিনারের (Dobereiner) ত্রয়ীসূত্র (Law of Triads) উপস্থাপনে। তোমরা খেয়াল করলে দেখতে পাবে যে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আমাদের সাজাবার রসায়নবিদদের প্রচেষ্টায় সংখ্যা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ডোবেরিনার বললেন যে তিনটি রাসায়নিক সাদৃশ্য সম্পন্ন মৌলের মধ্যে মাঝের মৌলটির পারমাণবিক ভর (পাঃ ভঃ) অন্য দুটি মৌলের পারমাণবিক ভরের গড় হবে। যেমন লিথিয়াম, সোডিয়াম এবং পটাশিয়ামের পারমাণবিক ভর যথাক্রমে 7, 23 এবং 39। ডোবেরিনারের সূত্র অনুযায়ী —

$$\text{সোডিয়ামের পারমাণবিক ভর} = \frac{\text{লিথিয়ামের পাঃ ভঃ} + \text{পটাশিয়ামের পাঃ ভঃ}}{2}$$

অর্থাৎ $\frac{7+39}{2} = 23$

ডোবেরিনারের ত্রয়ীসূত্রের প্রয়োগ ছিল খুবই সীমিত। তাই এই সূত্র বাস্তব গুরুত্ব অর্জন করতে পারে নি। সারণি-10 থেকে তোমরা আরো ত্রয়ীমৌলের পরিচয় পেতে পার।

সারণি-10 ঃ ডোবেরিনারের ত্রয়ী মৌল

ত্রয়ী মৌল	পাঃ ভঃ যথাক্রমে	প্রথম এবং তৃতীয় মৌলের পাঃ ভরের গড়
S, Se, Te	32, 79, 128	$\frac{32+128}{2} = 80$
Cl, Br, I	35·5, 80, 127	$\frac{35.5+127}{2} = 81.25$
Ca, Sr, Ba	40, 88, 137	$\frac{40+137}{2} = 88.5$

1862 সালে ফ্রান্সের রসায়নবিদ দ্য. চ্যানকোর্টোয়িস (De. Chancourtois) জানালেন যে আমাদের আচার-আচরণ সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। পারমাণবিক ভরের ক্রম অনুসারে আমাদের বেলনাকারে সাজিয়ে তিনি প্যাঁচালো পর্যায় সারণি (Spiral Periodic Table) উপস্থাপিত করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে আমাদের সমধর্মী সদস্যরা প্যাঁচের কেন্দ্র থেকে টানা উল্লম্ব রেখায় অবস্থান করে। পরবর্তী সময়ে আমাদের অধিকাংশ সদস্যদের নিয়ে চ্যানকোর্টোয়িস

ধারণা পরিপুষ্ট প্যাঁচালো পর্যায় সারণি (চিত্র-12) প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানী মহলে বোধ হয় এটি তেমন সমাদর পায় নি। বোধ করি বিজ্ঞানিগণ ঘোর-প্যাঁচের আবর্তে বন্দী অবস্থায় আমাদের দেখতে চান নি।

চিত্র-12 ঃ প্যাঁচানো পর্যায় সারণি
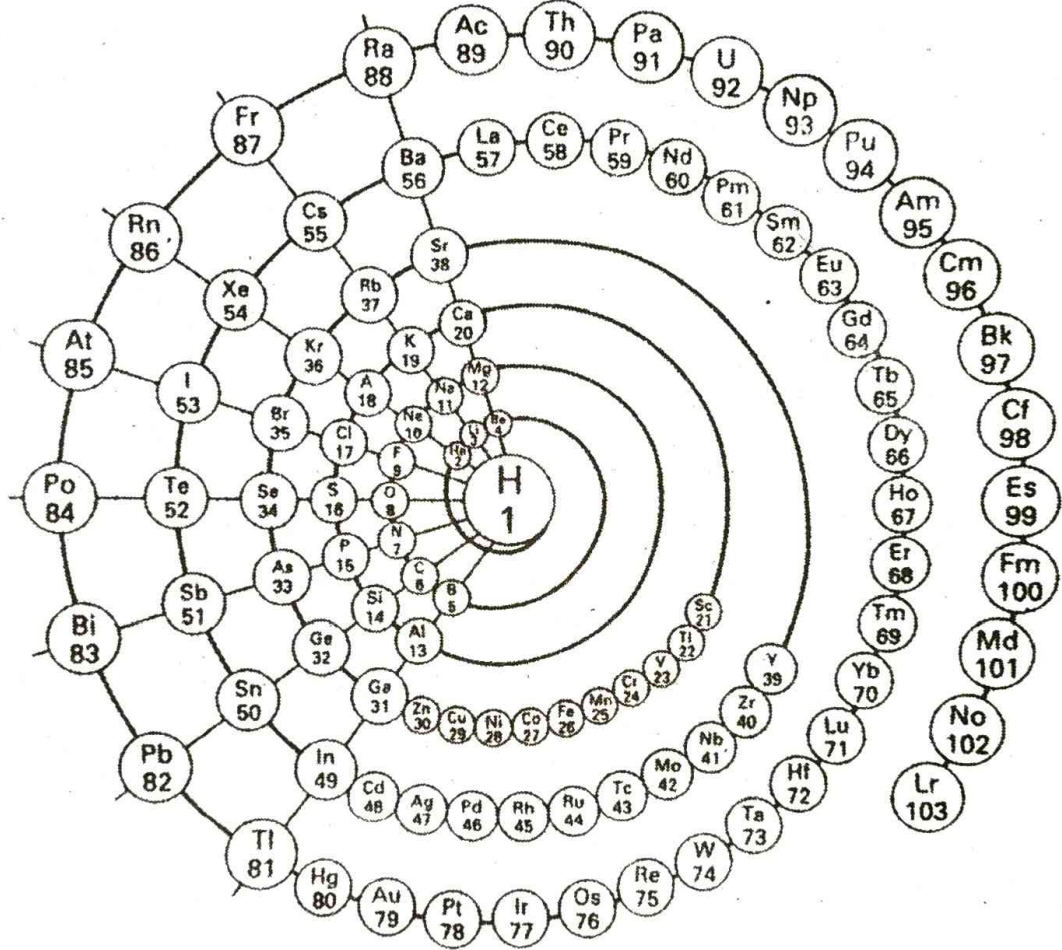
আকাশে বিরাজমান সপ্তর্ষিমণ্ডল, দৃশ্য আলোর গভীরে অবস্থিত সাতটি রং, সাতটি বার নিয়ে একটি সপ্তাহ, সাত পাকের বাঁধনে হিন্দু সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা, সঙ্গীতের জগতে সাতের মহিমা— সা - রে - গা - মা - পা - ধা - নি - সা, অষ্টম সুরটি যেন প্রথম সুরের অনুরূপ তেমনি আমাদের মৌলদের ধর্ম-কর্মের মধ্যেও যেন সাতের এক মহিমা খুঁজে পেলেন ব্রিটিশ রসায়নবিদ নিউল্যান্ডস (Newlands)। 1864 সালে তিনি বললেন যে প্রথম সংখ্যা থেকে সপ্তম সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলগুলি বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্মের অধিকারী, অষ্টম সংখ্যক মৌলটি আচার-আচরণের নিরিখে প্রথম মৌলের অনুগামী। এটি নিউল্যান্ডসের "অষ্টক সূত্র" (Newlands Law of Octaves) নামে পরিচিত। এর প্রয়োগ পরিধিও পর্যাপ্ত নয়।

নিউল্যান্ডস সংখ্যার ক্রম অনুসারে আমাদের সাজিয়ে আমাদের আচার-আচরণের পুনরাবৃত্তির

একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেন (চিত্র-13), যদিও অনেক মৌলই তখন ছিল অজানা এবং নিউল্যান্ডসের অষ্টক সূত্র বাস্তবে ক্যালসিয়ামের পরের মৌলদের জন্য ছিল অপ্রযোজ্য।

চিত্র -13 ঃ নিউল্যান্ডসের অষ্টক সূত্র অনুযায়ী আমাদের অবস্থান

H 1	Li 2	Be 3	B 4	C 5	N 6	O 7
F 8	Na 9	Mg 10	AL 11	Si 12	P 13	S 14
Cl 15	K 16	Ca 17	Cr 18	Ti 19	Mn 20	Fe 21

1869 সালে মেন্ডেলেয়েভ তাঁর পর্যায়সূত্র পেশ করে বললেন, "মৌল সমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী তাদের পারমাণবিক ভরের ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত হয়।" খেয়াল করলে তোমরা বুঝতে পারবে যে পর্যায় সূত্রের পটভূমিতে কী প্রখর দূরদৃষ্টির পরিচয় রেখেছিলেন মেন্ডেলেয়েভ। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় যে আমাদের আচার-আচরণ, ধর্ম-কর্মের সঙ্গে আমাদের ভরের অবশ্যই কোনো যোগসূত্র থাকবে। তিনি আমাদের প্রত্যেকের জন্য ঠিকুজি তৈরিতে মন দিলেন। আমাদের ঠিকুজিতে তিনি লিপিবদ্ধ করলেন আমাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী। আমাদের ঠিকুজি নিয়ে নিয়মিত নাড়াচাড়া করতে করতে মেন্ডেলেয়েভ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে নির্দিষ্ট ব্যবধানের পর আমাদের ধর্মে-কর্মে বিশেষ সাদৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে আমাদের ধর্ম পারমাণবিক ভরের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। আর তার ভিত্তিতেই 1871 সালে প্রকাশিত হয় মেন্ডেলেয়েভের আদি পর্যায় সারণি (চিত্র-14)।

চিত্র-14 ঃ মেন্ডেলেয়েভের আদি পর্যায় সারণি

পর্যায় → / শ্রেণী ↓	I R_2O	II RO	III R_2O_3	IV RH_4 RO_2	V RH_3 R_2O_5	VI RH_2 RO_3	VII RH R_2O_7	VIII RO_4
1	H = 1 Li = 7	Bc = 9.4	B = 11	C = 12	N = 14	O = 16	F = 19	
2	Na = 23	Mg = 24	Al = 27.3	Si = 28	P = 31	S = 32	Cl = 35.5	
3	K = 39 Cu = 63	Ca = 40 Zn = 65	* = 44 * = 68	Ti = 48 * = 72	V = 51 As = 75	Cr = 52 Se = 78	Mn = 55 Br = 80	Fe = 56, Ni = 59, Co = 59
4	Rb = 85 Ag = 108	Sr = 87 Cd = 112	Y = 88 In = 113	Zr = 90 Sn = 118	Nb = 94 Sb = 122	Mo = 96 Te = 125	* = 100 I = 127	Ru = 104, Rh = 104, Pd = 106
5	Cs = 133 Au = 199	Ba = 137 Hg = 200	Di = 138 Er = 178 Tl = 204	Ce = 140 La = 180 Pb = 207 Th = 231	Ta = 182 Bi = 208	W = 184 U = 240		Os = 195, Ir = 197 Pt = 198

* অনাবিষ্কৃত মৌল

মেন্ডেলেয়েভের আদি পর্যায় সারণিতে নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং বিরলমৃত্তিকা মৌলসমূহ ছিল অনুপস্থিত কারণ তখনও পর্যন্ত তারা ছিল অপরিচিত। মেন্ডেলেয়েভের পর্যায় সারণিতে আরো কিছু অসংগতি এবং অসম্পূর্ণতা ধরা পড়লেও বিজ্ঞানীরা পরবর্তী সময়ে মেন্ডেলেয়েভের পর্যায় সারণিকেই সংশোধিত আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেন।

কোনো মৌলের এক গ্রাম পরমাণুর (gm atom) আয়তনকে বলা হয় ঐ মৌলের পারমাণবিক আয়তন (Atomic Volume)। 1870 সালে জার্মান বিজ্ঞানী লোথার মেয়ার (Lother Meyer) আমাদের পারমাণবিক ভর (ভুজ, Abscissa) বনাম পারমাণবিক আয়তনের (কোটি, Ordinate) লেখচিত্র অঙ্কন করেন (চিত্র-15) যা অনেকটা সাতটি শীর্ষ বিশিষ্ট তরঙ্গাকার। সাতটি শীর্ষযুক্ত তরঙ্গভাগ পর্যায় সারণির সাতটি পর্যায় নির্দেশ করে। তরঙ্গায়িত লেখচিত্রটি লক্ষ্য করলে তোমরা দেখতে পাবে।

ক) প্রতি তরঙ্গের শীর্ষে আছে আমাদের হালকা, ক্ষারীয়, সক্রিয় পরাতড়িৎধর্মী ধাতব সদস্যরা।

খ) তরঙ্গের তলদেশে অবস্থান করে অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয়, উচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট ভারী সদস্যরা।

গ) প্রতিটি তরঙ্গের উর্ধ্বমুখী অংশে বিরাজ করে অপরা-তড়িৎধর্মী অধাতব সদস্যরা।

ঘ) আর তরঙ্গের নিম্নমুখী অংশে আছে পরা- তড়িৎধর্মী ধাতব সদস্যরা।

চিত্র-15 ঃ লোথার মেয়ারের মৌলের পারমাণবিক ভর বনাম পারমাণবিক আয়তনের লেখচিত্র
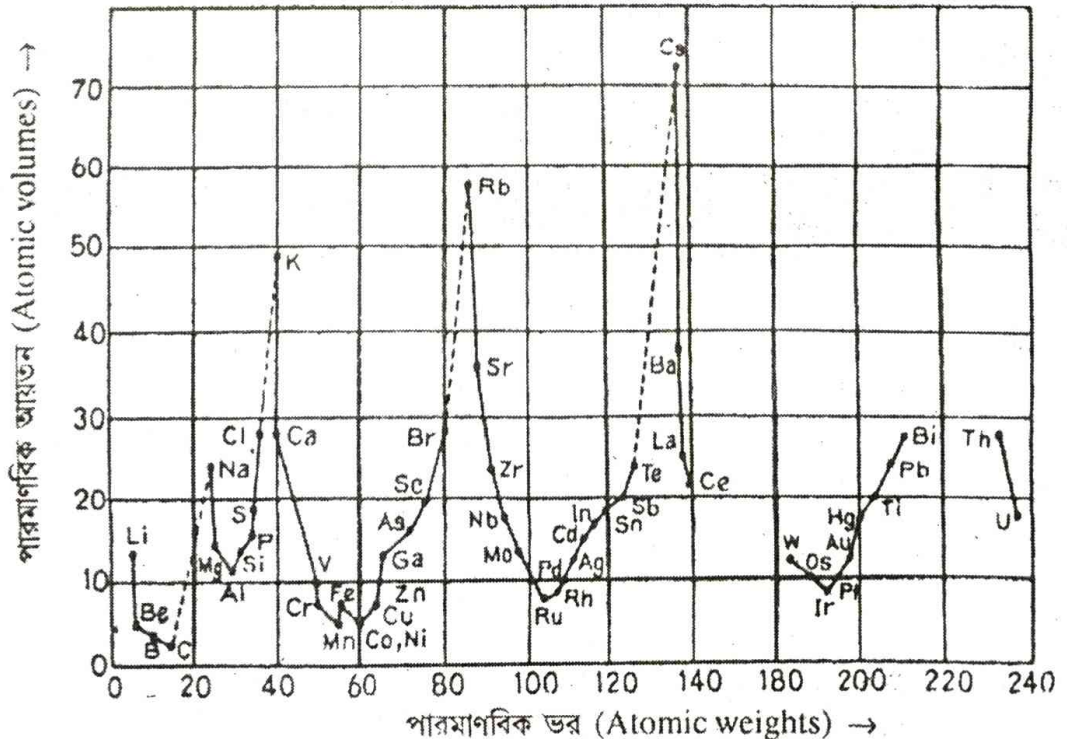
1914 সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী হেনরি মোজলে (Henry Moseley) আমাদের রঞ্জন রশ্মি বর্ণালি বীক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসেন যে পরমাণু ক্রমাঙ্কই আমাদের মৌলিকত্বের প্রকৃত দাবিদার, পারমাণবিক ভর নয়, ফলে পর্যায় সূত্র সংশোধিত হল। পারমাণবিক ভরের স্থান দখল করে নিল পারমাণবিক সংখ্যা বা পরমাণু ক্রমাঙ্ক। প্রকাশিত হল সংশোধিত মেন্ডেলেয়েভের পর্যায় সারণি, যাতে সংযোজিত হল নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং বিরল মৃত্তিকা মৌল সমূহ (চিত্র-16)। পারমাণবিক ভরের ভিত্তিতে রচিত মেন্ডেলেয়েভের আদি পর্যায় সারণিতে ছিল 5টি পর্যায় এবং 8টি শ্রেণি। পরমাণু ক্রমাঙ্কের ভিত্তিতে প্রকাশিত সংশোধিত মেন্ডেলেয়েভের পর্যায় সারণিতে আছে 7টি পর্যায় এবং 9টি শ্রেণি। খেয়াল করলে দেখতে পাবে যে আমরা সমধর্মী সদস্যরা একটি পর্যায় অতিক্রম করে একই শ্রেণির বিভিন্ন কক্ষে ঠাঁই পাই। সমধর্মী বললেও আমরা সবাই সবসময় সমধর্ম পালন করি এমনটা বলা যাবে না। বিজ্ঞানিগণ, তাই একই শ্রেণিভুক্ত মৌলদের A এবং B শাখায় ভাগ করেছেন। যেমন শ্রেণি IA-তে ঠাঁই পেয়েছে হাইড্রোজেন সহ Li, Na, K, Rb, Cs, Fr এবং IB-তে আছে Cu, Ag, Au। হাইড্রোজেনের অবস্থান নিয়ে অবশ্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক ছিল এবং টানা পোড়েন এখনও চলেছে বলতে পার। তাছাড়া মূল অট্টালিকায় বিরল মৃত্তিকা মৌলদের ঠাঁই হয় নি।

চিত্র-16 ঃ মেন্ডেলেয়েভের সংশোধিত পর্যায় সারণি

পর্যায় → ↓ শ্রেণী	i		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	0
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
1	1^{H}															2^{He}
2	3^{Li}		4^{Be}			5^{B}		6^{C}		7^{N}		8^{O}		9^{F}		10^{Ne}
3	11^{Na}		12^{Mg}			13^{Al}		14^{Si}		15^{P}		18^{S}		17^{Cl}		18^{Ar}
4	19^{K}		20^{Ca}		21^{Sc}		22^{Ti}		23^{V}		24^{Cr}		25^{Mn}		26^{Fe}, 27^{Co} 28^{Ni}	
		29^{Cu}		30^{Zn}		31^{Ga}		32^{Ge}		33^{As}		34^{Se}		35^{Br}		36^{Kr}
5	37^{Rb}	47^{Ag}	38^{Sr}	48^{Cd}	39^{Y}	49^{In}	40^{Zr}	50^{Sn}	41^{Nb}	51^{Sb}	42^{Mo}	52^{Te}	43^{Tc}	53^{I}	44^{Ru}, 45^{Rh} 46^{Pd}	54^{Xe}
6	55^{Cs}		56^{Ba}		$57\text{-}71^{La*}$		72^{Hf}		73^{Ta}		74^{W}		75^{Re}		76^{Os}, 77^{Ir}, 78^{Pt}	
		79^{Au}		80^{Hg}		81^{Tl}		82^{Pb}		83^{Bi}		84^{Po}		85^{At}		86^{Rn}
7	87^{Fr}		88^{Ra}		$89\text{-}104^{Ac**}$											

* Lanthanides · 58^{Ce}, 59^{Pr}, 60^{Nd}, 61^{Pm}, 62^{Sm}, 63^{Eu}, 64^{Gd}, 65^{Tb}, 66^{Dy}, 67^{Ho}, 68^{Er}, 69^{Tm}, 70^{Yb}, 71^{Lu}

** Actinides : 90^{Th}, 91^{Pa}, 92^{U}, 93^{Np}, 94^{Pu}, 95^{Am}, 96^{Cm}, 97^{Bk}, 98^{Cf}, 99^{Es}, 100^{Fm}, 101^{Md}, 102^{No}, 103^{Lw}

আমাদের পরমাণু ও আয়নের তুলনামূলক আকারের ভিত্তিতে বিজ্ঞানী জে. এ. কেম্পবেল (J. A. Campbell) 1946 সালে পর্যায় সারণির একটি রূপ তুলে ধরলেন (চিত্র-17) যা আমাদের ক্রিয়াকলাপ বুঝতে তোমাদের খুব সহায়ক হবে।

চিত্র-17 ঃ পরমাণু এবং আয়নের তুলনামূলক আকারের (Å একক) ভিত্তিতে রচিত কেম্পবেলের পর্যায় সারণি
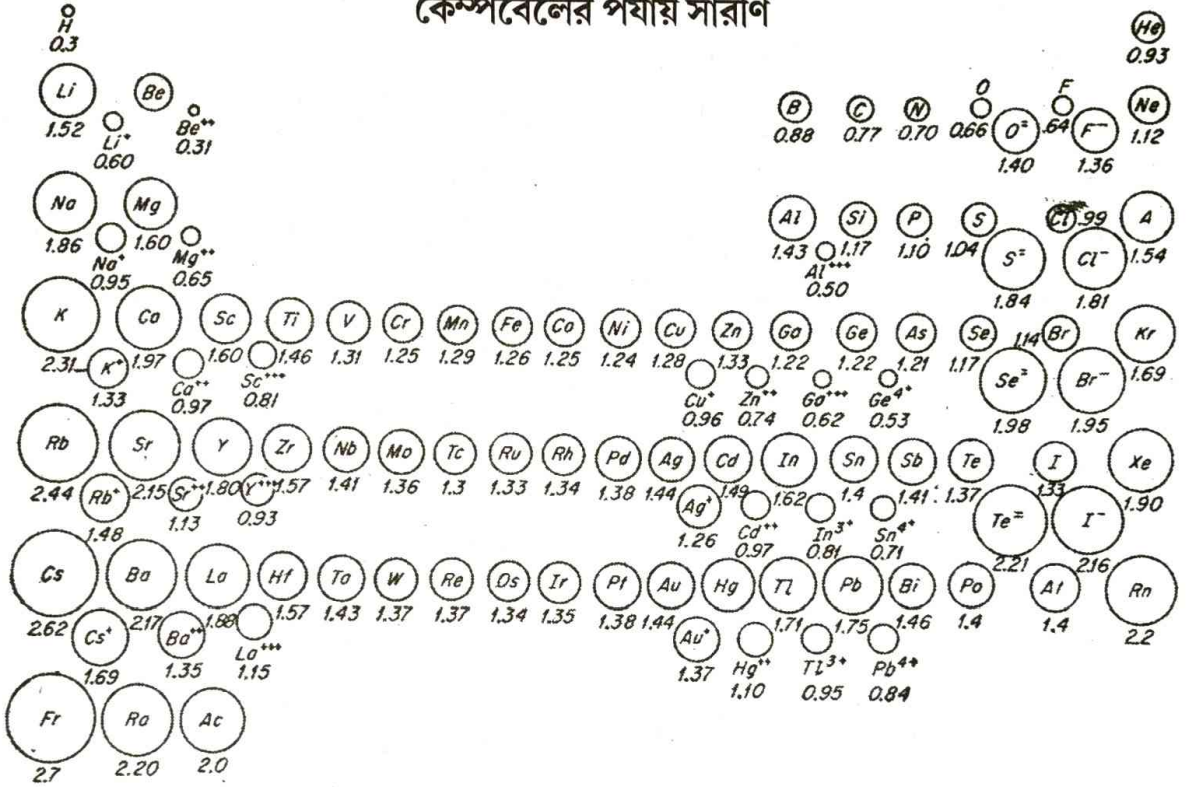
একই কক্ষে A, B চিহ্নিত করে সাদৃশ্যহীন মৌলদের ঠাঁই দিয়ে বিজ্ঞানীরা স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। বিজ্ঞানীদের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল কীভাবে এই অসংগতি দূর করা যায়। শেষ পর্যন্ত 1985 সালে আমাদের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের ভিত্তিতে 7টি পর্যায় এবং 16টি শ্রেণি সংবলিত দীর্ঘ পর্যায় সারণি (Long form of Periodic Table) প্রকাশিত হল (চিত্র-18) এটি বোরের পর্যায় সারণি (Bohr's Periodic Table) বলে পরিচিত। আমাদের প্রায় সকল সদস্যেরই আলাদা আলাদা ঘর জুটল। বাদ পড়ল আয়রন, কোবাল্ট, নিকেল প্রভৃতি, পূর্বেকার অষ্টম শ্রেণির অধিবাসীরা। বিরল মৃত্তিকা মৌলরাও থেকে গেল মূল অট্টালিকার বাইরে—পার্শ্ববর্তী আলাদা ব্লকে।

সর্বাধুনিক IUPAC অনুমোদিত পর্যায় সারণি প্রকাশিত হয় 1994 সালে, যাতে আছে 7টি পর্যায় এবং 18টি শ্রেণি (চিত্র-19)। আয়রন, কোবাল্ট, নিকেল প্রভৃতি আগেকার অষ্টম শ্রেণির মৌলরাও নিজেদের আলাদা আলাদা ঘর পেল। বিরল মৃত্তিকা মৌলরা যেমন ছিল তেমনি রইল — মূল অট্টালিকায় এদের আলাদা আবাসের ব্যবস্থা আর হল না, বর্তমান

চিত্র-18 ঃ দীর্ঘ পর্যায় সারণি

পর্যায় → / শ্রেণী ↓	IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIII			IB	IIB	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	0
I →	H 1																H 1	He 2
II →	Li 3	Be 4											B 5	C 6	N 7	O 8	F 9	Ne 10
III →	Na 11	Mg 12											Al 13	Si 14	P 15	S 16	Cl 17	Ar 18
IV →	K 19	Ca 20	Sc 21	Ti 22	V 23	Cr 24	Mn 25	Fe 26	Co 27	Ni 28	Cu 29	Zn 30	Ga 31	Ge 32	As 33	Se 34	Br 35	Kr 36
V →	Rb 37	Sr 38	Y 39	Zr 40	Nb 41	Mo 42	Tc 43	Ru 44	Rh 45	Pd 46	Ag 47	Cd 48	In 49	Sn 50	Sb 51	Te 52	I 53	Xe 54
VI →	Cs 55	Ba 56	La* 57	Hf 72	Ta 73	W 74	Re 75	Os 76	Ir 77	Pt 78	Au 79	Hg 80	Tl 81	Pb 82	Bi 83	Po 84	At 85	Rn 86
VII →	Fr 87	Ra 88	Ac** 89															
*Lanthanides			Ce 58	Pr 59	Nd 60	Pm 61	Sm 62	Eu 63	Gd 64	Tb 65	Dy 66	Ho 67	Er 68	Tm 69	Yb 70	Lu 71		
**Actinides			Th 90	Pa 91	U 92	Np 93	Pu 94	Am 95	Cm 96	Bk 97	Cf 98	Es 100	Fm 101	Md 101	No 102	Lw 103		

কাঠামোতে হবারও নয়। তাই এই ব্যবস্থাও নিখুঁত হয়েছে বলা যাবে না। চূড়ান্ত নিখুঁত কি কিছু আছে ! তোমাদের কী মনে হয় !

চিত্র-19 ঃ IUPAC অনুমোদিত বর্তমান পর্যায় সারণি

পর্যায় → / শ্রেণী ↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	57 La*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89 Ac**	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Uub	(113) Uut	(114) Uug	(115) Uup	(116) Uuh	(117) Uus	(118) Uuo
* Lanthanides				58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu	
** Actinides				90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr	

তোমরা জান যে আমাদের পরমাণুর কেন্দ্রকে থাকে পরাতড়িৎধর্মী প্রোটন এবং নিস্তড়িৎ নিউট্রন আর কেন্দ্রককে ঘিরে বিভিন্ন বৃত্তাকার ও উপবৃত্তাকার কক্ষপথে বিচরণ করে ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের অবস্থানের কথা বলতে গিয়ে বিজ্ঞানিগণ কক্ষক-মতবাদ (Orbital concept) টেনে এনেছেন। তাঁরা বলেছেন যে ইলেকট্রন বিভিন্ন কক্ষের (Orbit) অন্তর্গত নির্দিষ্ট কক্ষকে (Orbital) অবস্থান করে। অর্থাৎ বিচরণশীল একটি ইলেকট্রনকে যে এলাকায় পাবার সম্ভাবনা সর্বাধিক সেই এলাকাকে তাঁরা কক্ষক বলে চিহ্নিত করতে চান। তাঁরা বিভিন্ন কক্ষককে s, p, d, f নামাঙ্কিত করেছেন বর্ণালি সংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ sharp, principal, diffuse এবং fundamental থেকে। এদের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা ভিন্ন। s-কক্ষক দুটি ইলেকট্রন ধারণ করতে পারে, p-কক্ষক ছটি, d-কক্ষক দশটি এবং f- কক্ষক চৌদ্দটি। বিজ্ঞানী পাউলি (Pauli) জানালেন যে একটি কক্ষক সর্বাধিক দুটি ইলেকট্রন ধারণ করাতে পারে আর তাও বিপরীত ঘূর্ণন (spin)সম্পন্ন। অর্থাৎ ইলেকট্রন ধারণ করার জন্য একটি s-কক্ষক, তিনটি p-কক্ষক, পাঁচটি d-কক্ষক এবং সাতটি f-কক্ষকের অস্তিত্বের কথা বলা হল।

বিজ্ঞানিগণ আমাদের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস nl^x প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাইলেন। 'n' মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং l গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা নির্দেশ করে। n এর মান 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি হতে পারে, যা প্রথম (K), দ্বিতীয় (L), তৃতীয় (M), চতুর্থ (N) কক্ষ বোঝায়। গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা l কোনো কক্ষের অন্তর্গত উপকক্ষ বা কক্ষক নির্দেশ করে। l এর মান হয় 0 থেকে $n-1$. অর্থাৎ n যদি 1 হয় l এর মান হবে 0 ; তেমনি $n = 2$ হলে l হবে 0, 1; $n=3$ হলে l হবে 0, 1, 2; $n = 4$ হলে l হবে 0, 1, 2, 3 । l-এর মান 0 s-কক্ষক, 1 p-কক্ষক, 2 d-কক্ষকএবং 3 f-কক্ষক নির্দেশ করে। x কোনো কক্ষের অন্তর্গত l-এর মান অনুযায়ী কক্ষকে ইলেকট্রন সংখ্যা বোঝায়, বিভিন্ন কক্ষকস্থিত x-এর যোগফল পরমাণু ক্রমাংঙ্কের সমান হবে। তোমরা জান পরমাণু ক্রমাঙ্ক আমাদের পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা বা ইলেকট্রন সংখ্যা নির্দেশ করে। আমাদের পরমাণুর ইলেকট্রন সজ্জার কথা বলতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আরো জানালেন যে স্বাভাবিক অবস্থায় ইলেকট্রন সম্ভাব্য নিম্ন শক্তি স্তরে প্রবেশ করতে পছন্দ করে। নীচের সারণি থেকে আমাদের জনাকয় সদস্যের ইলেকট্রন বিন্যাস তোমরা দেখে নিতে পার।

সারণি-11 ঃ ইলেকট্রন বিন্যাস

মৌল	পরমাণু ক্রমাঙ্ক	ইলেকট্রন বিন্যাস
হাইড্রোজেন	1	$1s^1$
হিলিয়াম	2	$1s^2$
কার্বন	6	$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$
অক্সিজেন	8	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$
নিয়ন	10	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$
স্ক্যান্ডিয়াম	21	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^1\ 4s^2$
ক্রোমিয়াম	24	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^5\ 4s^1$
সেরিয়াম	58	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6\ 4d^{10}\ 5s^2\ 5p^6\ 4f^1\ 5d^1\ 6s^2$

ইলেকট্রন সজ্জার ভিত্তিতে বিজ্ঞানিগণ আমাদের মৌলদের s-ব্লক, p-ব্লক, d-ব্লক এবং f-ব্লক বিশেষণে ভূষিত করলেন। আমাদের পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের শেষ ইলেকট্রনটি যে কক্ষকে প্রবেশ করে তার নাম অনুসারে আমরা কোন্ ব্লকের অন্তর্গত তা নির্ণয় করা হয়। বিজ্ঞানীরা গণনা করে জানিয়েছেন যে বিভিন্ন কক্ষকের ইলেকট্রনের শক্তিমাত্রা নীচের ক্রম অনুসারে বৃদ্ধি পায় ঃ

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f \ldots\ldots$$

আমাদের কেউ কেউ s-ব্লক মৌল যেমন — হাইড্রোজেন, সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, কেউ কেউ p-ব্লক মৌল যেমন — কার্বন, অক্সিজেন, নিয়ন; কেউ কেউ d-ব্লক মৌল যেমন — স্ক্যান্ডিয়াম, ক্রোমিয়াম আর কেউ কেউ যেমন সেরিয়াম, থোরিয়াম f-ব্লক মৌল রূপে পরিচিত হলাম।

প্রকৃতিতে প্রাচুর্যের বিচারে এবং নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসূচক আচার-আচরণের সুবাদে আমাদের s-ব্লক এবং p-ব্লক সদস্যরা আদর্শ মৌল (Typical বা Representative Elements) গণ্য হল। ব্যতিক্রম ns^2np^6ইলেকট্রন বিন্যাস সম্পন্ন মৌলগুলি। p-ব্লক মৌল হলেও প্রকৃতিতে এরা অতি অল্প মাত্রায় বিরাজ করে। তাছাড়া নির্লিপ্ত নিরাসক্ত প্রকৃতির জন্য এরা নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলেই পরিচিত। হিলিয়াম, নিষ্ক্রিয় গ্যাস পরিবারের সদস্য হলেও, s-ব্লক মৌল।

d-ব্লক মৌলগুলি (সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাস ns^{1-2} $(n-1)d^{1-9}$) সন্ধিগত মৌল

(Transitional Elements) নামে পরিচিত। এদের আচার আচরণ আদর্শ সদস্যদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের একাধিক যোজ্যতা থাকে, এরা বর্ণময় আয়ন তৈরি করে, প্রস্তুত করে জটিল লবণ। অনুঘটকের ভূমিকায় রাসায়নিক মিলনে ঘটকালি করতেও এদের দেখা যায়। এদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ভিতরের কক্ষ সম্পূর্ণ পূর্ণ না করেই বাইরের কক্ষে প্রবেশ করে। জিংক, ক্যাডমিয়াম মৌলদের প্রকৃত অর্থে সন্ধিগত মৌল বলে গণ্য করা চলে না কারণ এদের ক্ষেত্রে ভিতরের d - কক্ষক থাকে সম্পূর্ণ পূর্ণ। চরিত্রের দিক থেকে d-ব্লক মৌলগুলি s - ব্লক মৌল এবং p-ব্লক মৌলের সন্ধিস্থলে বিরাজ করে বলেই এদের সন্ধিগত মৌল নামকরণ হয়েছে।

f-ব্লক মৌলদের ক্ষেত্রে ভিতরে দুটি কক্ষ অপূর্ণ রেখেই ইলেকট্রন বাইরের কক্ষে প্রবেশ করে। এদের সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাস $(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-1}ns^2$ এরা আভ্যন্তরীণ সন্ধিগত মৌল (Inner Transition Elements) নামে পরিচিত।

সারণি -12 ঃ আমাদের শ্রেণি বিন্যাসের সামগ্রিক চিত্র

মৌল	ইলেকট্রন বিন্যাস	পরিচিতি	শ্রেণি (দীর্ঘ পর্যায় সারণি)	শ্রেণি (পর্যায় সারণি, IUPAC)	পর্যায়ক্রমে সদস্যগণ
s-ব্লক মৌল (আদর্শ মৌল)	ns^1	ক্ষার ধাতু	IA	1	H*, Li, Na, k, Rb, Cs, Fr* ব্যতিক্রম
	ns^2	ক্ষার মৃত্তিকা ধাতু	IIA	2	Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
d-ব্লক মৌল (সন্ধিগত মৌল)	$(n-1)d^1ns^2$	সন্ধিগত মৌল	IIIA	3	Sc, Y, La*, Ac**
	$(n-1)d^2ns^2$	সন্ধিগত মৌল	IVA	4	Ti, Zr, Hf, Rf
	$(n-1)d^3ns^2$	সন্ধিগত মৌল	VA	5	V, Nb, Ta, Db
	$(n-1)d^5ns^1$	সন্ধিগত মৌল	VIA	6	Cr. Mo, W, Sg
	$(n-1)d^5ns^2$	সন্ধিগত মৌল	VIIA	7	Mn, Tc, Re, Bh

	$(n-1)d^6ns^2$	সন্ধিগত মৌল	VIII	8	Fe, Ru, Os, Hs
	$(n-1)d^7ns^2$	সন্ধিগত মৌল	VIII	9	Co, Rh, Ir, Mt
	$(n-1)d^8ns^2$	সন্ধিগত মৌল	VIII	10	Ni, Pd, Pt, Ds
	$(n-1)d^{10}ns^1$	সন্ধিগত মৌল	IB	11	Cu, Ag, Au, Rg
	$(n-1)d^{10}ns^2$	সন্ধিগত মৌল	IIB	12	Zn, Cd, Hg, Uub
	ns^2np^2	বোরন পরিবার	IIIB	13	B, Al, Ga, In, Tl, Uut
p-ব্লক মৌল	ns^2np^2	কার্বন পরিবার	IVB	14	C, Si, Ge, Sn, Pb, Uug
(আদর্শ মৌল)	ns^2np^3	নাইট্রোজেন পরিবার	VB	15	N, P, As, Sb, Bi, Uup
	ns^2np^4	অক্সিজেন পরিবার	VIB	16	O, S, Se, Te, Po, Uuh
	ns^2np^5	হ্যালোজেন পরিবার	VIIB	17	F, Cl, Br, I, At,Uus
(নিষ্ক্রিয় গ্যাস)	ns^2np^6	নিষ্ক্রিয় গ্যাস পরিবার	O	18	He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Uuo
f-ব্লক মৌল	$(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-2}ns^2; 4f^{1-14}\ 5d^{0-1}6s^2$ ল্যান্থানাইডস* ($Cs^{58} - Lu^{71} = 14$ টি মৌল)				
(আভ্যন্তরীণ সন্ধিগত মৌল)	$5f^{1-14}\ 6d^{0-1}7s^2$ অ্যাক্টিনাইডস ** ($Th^{90} - Lr^{103} = 14$ টি মৌল)				

পর্যায় সারণির ষষ্ঠ পর্যায় এবং তিন নম্বর শ্রেণিতে ল্যান্থানামের সঙ্গে আছে আরো চৌদ্দটি মৌল $(Cc^{57} - Lu^{71})$। এরা ল্যান্থানাইড সারির সদস্য। তেমনি পর্যায় সারণির সপ্তম পর্যায়ে এবং তিন নম্বর শ্রেণিতে অ্যাক্টিনিয়ামের সঙ্গে আছে আরো চৌদ্দটি মৌল $(Th^{90} - Lr^{103})$। এরা অ্যাক্টিনাইড সারির সদস্য। তোমরা দেখেছ পর্যায় সারণিতে

মূল অট্টালিকার পাশে আলাদা ব্লকে ল্যান্থানাইড সারি এবং অ্যাক্টিনাইড সারির সদস্যদের ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। আভ্যন্তরীণ সন্ধিগত মৌল গোষ্ঠীর এই সদস্যরা প্রতিবেশী সন্ধিগত মৌলদের মতো একাধিক যোজ্যতা দেখায় এবং বর্ণময় জটিল লবণ প্রস্তুত করে। ল্যান্থানাইড সারির সদস্যদের অভিন্ন রাসায়নিক প্রকৃতি রসায়নবিদদের কাছে ছিল চরম বিভ্রান্তিকর। অ্যাক্টিনাইড সারির সদস্যরা তেজস্ক্রিয়।

সারণি - 12 থেকে আমাদের শ্রেণি বিন্যাসের একটা সামগ্রিক চিত্র তোমরা পেয়ে যাবে। তোমরা খেয়াল করলে দেখতে পাবে যে আমাদের আচার-আচরণে এক নিয়মিত পর্যায় ক্রমিকতা (Periodicity) বিদ্যমান অবশ্য আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ব্যতিক্রম কিছুমাত্র ঘটে না এমন দাবি করা সমীচীন হবে না। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে আমাদের পরমাণুর আকার, কেন্দ্রকের আধান, ইলেকট্রন বিন্যাস প্রভৃতি আমাদের বিভিন্ন ধর্মকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে।

তোমরা জান শক্তি প্রয়োগে আমাদের পরমাণুর বাইরের স্তরের ইলেকট্রন উত্তেজিত হয় এবং অধিক শক্তিস্তরে উন্নীত হয়। আরো শক্তি প্রয়োগ করলে ইলেকট্রন আমাদের পরমাণুর কেন্দ্রকের মায়ার বাঁধন কাটিয়ে দূরে সরে যায় এবং পরাতড়িৎবাহী একমাত্রিক আয়নের জন্ম দেয়। যে ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগে ঘটনাটি সংঘটিত হয় সেই শক্তিকে আমাদের প্রথম আয়ন-বিভব (Ionization potential) বলা হয়, যা হচ্ছে আমাদের পরমাণুর ইলেকট্রন ত্যাগ করার প্রবণতার মাপকাঠি। এর বিপরীত ধর্মটি হল ইলেকট্রন আকর্ষিতা (Electron affinity)। অর্থাৎ আমাদের পরমাণুতে ইলেকট্রন অনুপ্রবেশের ফলে যে শক্তির মুক্তি ঘটে তা ইলেকট্রন আকর্ষিতা সূচিত করে। আবার দুটি পরমাণুর বন্ধনে আবদ্ধ ইলেকট্রন জোড়কে নিজের কেন্দ্রকের দিকে টানার প্রবণতা পরমাণুটির অপরাধর্মিতা বা তড়িৎ ঋণাত্মকতা (Electronegativity) নির্দেশ করে।
আমাদের তড়িৎ ঋণাত্মকতা, আয়ন-বিভব, ইলেকট্রন আসক্তি পর্যায় সারণির একটি পর্যায় বরাবর পরমাণু ক্রমাঙ্ক বৃদ্ধির সঙ্গে বাম থেকে ডান দিকে বৃদ্ধি পায় এবং একটি শ্রেণি বরাবর উপর থেকে নীচের দিকে হ্রাস পায়। পরাতড়িৎধর্মিতার (Electro-positivity) প্রবণতা ঠিক উল্টো। ফ্লোরিন ক্লোরিন অপেক্ষা বেশি তড়িৎ ঋণাত্মক কিন্তু ক্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তি ফ্লোরিনের চেয়ে বেশি।

আমাদের পরমাণুর আকার (Atomic size) বা পরমাণুর ব্যাসার্ধ (Atomic radii) পর্যায় বরাবর বাম থেকে ডান দিকে হ্রাস পায় এবং শ্রেণি বরাবর উপর থেকে নীচের দিকে বৃদ্ধি পায়।

আমাদের অধাতব চরিত্র (Non-metallic character), জারণ ক্ষমতা (Oxidising power) এবং অক্সাইডের অ্যাসিড ধর্ম (Acidic nature of oxides) একটি পর্যায় বরাবর বাম থেকে ডান দিকে বৃদ্ধি পায় এবং একটি শ্রেণি বরাবর উপর থেকে নীচের দিকে হ্রাস পায়। অন্যদিকে ধাতব চরিত্র (Metallic character), বিজারণ ক্ষমতা (Reducing power) এবং অক্সাইডের ক্ষার ধর্মের (Basic nature of oxides) প্রবণতা ঠিক উল্টো।

তোমরা আমাদের 'ঘর-সংসারের' খবর নিতে চাও। আমাদের মেলামেশা সব সময়ই মিলনান্তক হয় এমন নয়, বিয়োগান্তক ঘটনাও ঘটে চলেছে। অর্থাৎ পারস্পরিক মেলামেশায় 'ঘর-বাঁধার' পাশাপাশি আমাদের গড়া পদার্থের বিভাজনে 'ঘর-ভাঙার' ঘটনাও ঘটছে।

শুনতে পাই তোমাদের সমাজে ছেলে-মেয়েরা যৌবনে পা দিলে একদল লোক তৎপর হয়ে ওঠেন। আলোচনা শুরু হয় নাম-ধাম-নাড়ী-নক্ষত্র-গোত্র-পারিবারিক অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে। বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের আনুষ্ঠানিক মিলনের পথ প্রশস্ত করাই এদের ব্যবসা। তাদের তোমরা বলে থাক ঘটক। অবশ্য কখনও পারস্পরিক নিবিড় মেলামেশার মাধ্যমে তরুণ-তরুণীদের মন দেয়া-নেয়ার পর্ব সম্পন্ন হতে দেখা যায়। কখনো মন্দিরে মালা বদলের মাধ্যমেও যুবক-যুবতীর মিলনের আয়োজন হয়ে থাকে, আবার কখনও কোর্ট-কাছারির সিলমোহর লাগিয়েও বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। আর কম বেশি বিদ্যুৎ এবং আলোর রোশনাই, ঢাকের তাল ও সানাইয়ের সুর, কখনও বাজিপটকার শব্দ তোমাদের মিলন উৎসবই ঘোষণা করে।

সপুষ্পক গাছ-গাছালির দিকে তাকালে দেখা যায় যৌবনে পা দিয়ে গাছ রং-বেরঙের ফুল ফোটায় আর গন্ধ ছড়ায় — ঘটকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই গাছের এত গন্ধ ও রঙের বাহার। প্রজাপতি, ফড়িং, মৌমাছি এরাই এক্ষেত্রে ঘটকালি করে। গল্পের পক্ষিরাজ ঘোড়া যেমন রাজপুত্তুরকে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে নিয়ে চলে রাজকন্যার দেশে তেমনি ফুল বরেরা (পরাগ) ঘটকদের কাঁধে চড়ে পাড়ি জমায় কনে ফুলের অন্দর মহলে (ডিম্বকোষ)।

আমাদের দিকে তাকালে তোমরা দেখতে পাবে যে তোমাদের মতোই আমাদের মেলামেশা-আমাদের মিলন, রসায়নবিদদের ভাষায় রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া, বিভিন্ন উপায়ে সংঘটিত হয়।

কখনো আমাদের মিলন ঘটে শুধুমাত্র আলিঙ্গনের মাধ্যমে (Simple Contact), কখনো চাপে (Pressure) পড়ে, কখনো তাপের (Temperature)প্রভাবে। আবার কখনো আলোক (Light) স্নাত হয়ে, কখনো বা বিদ্যুতের (Electricity) ছোঁয়ায় বা শব্দের (Sound) প্রভাবে। কখনো আবার অনুঘটকের (Catalyst) ঘটকালিতেও রাসায়নিক মিলন প্রভাবিত হয় (সারণি-13)।

সারণি -13 ঃ রাসায়নিক ক্রিয়া -বিক্রিয়ার বিভিন্ন উপায়

ক) ফসফরাস + আয়োডিন $\xrightarrow{\text{আলিঙ্গন}}$ ফসফরাস ট্রাইআয়োডাইড

খ) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড + ফসজিন $\xrightarrow{\text{চাপ}}$ ফসফোনিয়াম ক্লোরাইড

গ) হাইড্রোজেন + ক্লোরিন $\xrightarrow{\text{আলোক}}$ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড

ঘ) মারকিউরিক অক্সাইড $\xrightarrow{\text{তাপ}}$ মারকারি + অক্সিজেন

ঙ) জল $\xrightarrow{\text{তড়িৎ বিশ্লেষণ}}$ হাইড্রোজেন + অক্সিজেন

চ) অ্যাসেটিলিন $\xrightarrow{\text{শব্দ}}$ কার্বন + হাইড্রোজেন

ছ) পটাশিয়াম ক্লোরেট $\xrightarrow[\text{(অনুঘটক)}]{\text{ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড}}$ অক্সিজেন + পটাশিয়াম ক্লোরাইড

তোমাদের জীবন ও জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের বিবিধ যৌগের ক্রিয়া বিক্রিয়া। স্পর্শন, এমনকী দর্শন বা শ্রবণও জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার কারণ ঘটায়, তোমরা কি তা অনুভব কর!

তোমরা হয়তো প্রশ্ন করবে — "রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া কেন ঘটে? কীভাবে ঘটে ?" প্রশ্নটি রসায়নবিদদেরও ভাবিয়ে তুলেছিল। রাসায়নিক মিলনের প্রকৃতি নিয়ে তাঁদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই জিজ্ঞাসাবাদ চলছিল। বার্জেলিয়াসই প্রথম (1812) বললেন যে রাসায়নিক যৌগে পরমাণু সমূহের মধ্যে তড়িদাকর্ষণ বর্তমান। ফ্যারাডে তাঁর তড়িৎ বিশ্লেষণ সূত্র উপস্থাপিত (1834) করে বার্জেলিয়াসের ধারণাকে সমর্থন জানালেও 'যৌগে পরমাণুসমূহের তড়িতাকর্ষণ তত্ত্ব' প্রত্যাখ্যাত হল কারণ জৈব যৌগ মিথেনে কার্বনের সঙ্গে যুক্ত পরাধর্মী হাইড্রোজেনের অপরাধর্মী ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপন এক অমোঘ অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। অর্ধশতাব্দী কাল প্রায় এভাবেই কাটল। 1887 সালে এগিয়ে এলেন আরহেনিয়াস তাঁর 'তড়িৎ বিয়োজনবাদ তত্ত্ব' নিয়ে, ফলে যৌগে পরমাণুসমূহের তড়িদাকর্ষণ তত্ত্ব পুনর্জীবন পেল।

রাসায়নিক বন্ধনের রহস্য উন্মোচনের দুয়ার একদিন বাস্তবিকই খুলে গেল বলতে পার। সেদিন 30শে এপ্রিল, 1897 সাল। পরমাণুতে ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণিকা, ইলেকট্রনের উপস্থিতির কথা জানালেন থমসন। তিনি বললেন যে রাসায়নিক মিলনে ইলেকট্রন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর সম্ভবত পরমাণুসমূহের মধ্যে ইলেকট্রন আদান প্রদানই তড়িদাকর্ষণের জন্ম দেয়।

আমাদের বংশপঞ্জী, রসায়নবিদরা বলেন, পর্যায় সারণি, পর্যালোচনা করলে আমাদের মিলনের ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে। তোমরা জান পর্যায় সারণির একই শ্রেণিভুক্ত সদস্যরা আচার-আচরণ, কুলে-শীলে সমভাবাপন্ন। আর আমাদের মিলনেও ধন, মান ও কুলের বিচার অপরিহার্য। সগোত্র বিয়ে তো তোমাদের সমাজে প্রশস্ত গণ্য হয় না শুনতে পাই। আমাদের ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই। অবশ্য ব্যতিক্রম তোমাদের সমাজে আছে, আমাদের ক্ষেত্রেও ঘটে।

1916 সালে বিজ্ঞানী কোসেল এবং বিজ্ঞানী ল্যুইস আলাদাভাবে জানালেন যে ইলেকট্রন মালা বদলের মাধ্যমেই রাসায়নিক মিলন ঘটছে। রাসায়নিক মিলনে যাদের অনীহা তারা পর্যায় সারণির শূন্য শ্রেণিভুক্ত (IUPAC অনুমোদিত বর্তমান পর্যায় সারণির শ্রেণি 18), তাদের বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস। গলায় (বাইরের স্তরে) তাদের আট-ইলেকট্রন মালা, হিলিয়াম তার ব্যতিক্রম। তার গলায় আছে দুই ইলেকট্রনের মালা। কোসেল এবং ল্যুইস্ বললেন যে আট ইলেকট্রন মালা ধারণ কামনানাশক। তাঁদের এই ব্যবস্থাপত্র 'অষ্টক সূত্র' নামে খ্যাত। আর পরমাণুর আট ইলেকট্রন মালা ধারণের প্রবণতাই রাসায়নিক মিলনের চালিকা শক্তি।

আট-ইলেকট্রন মালা ধারণ ঘটছে কখনো পরমাণুর ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে, কখনো ইলেকট্রন জোড় গঠনের মাধ্যমে আবার কখনো ইলেকট্রন জোড় দান ও গ্রহণের মাধ্যমে। আমাদের পরমাণুর বাইরের স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা পর্যায়সারণিতে (দীর্ঘ পর্যায়) আমাদের শ্রেণি অবস্থান ও সর্বোচ্চ যোজ্যতা অর্থাৎ মিলন ক্ষমতা নির্দেশ করে। আমাদের পরমাণুর ইলেকট্রনকে তাই যোজ্যতা ইলেকট্রন আখ্যা দেওয়া হয়। কেউ কেউ বলতে চাইলেন যে আমাদের পরমাণুর বাইরের স্তরের ইলেকট্রন বয়ঃসন্ধিক্ষণোত্তর তরুণ-তরুণীদের মতো মিলন পিয়াসি অর্থাৎ 'বিয়ে-পাগলা'। তারা কেউ কেউ পরমাণুর কেন্দ্রকের মায়ার বাঁধন কাটিয়ে অন্য পরমাণুর ইলেকট্রনের সঙ্গে 'ঘর-বাঁধা'র স্বপ্ন দেখে। আর পরমাণু সমূহেরও এ ব্যাপারে সায় থাকে। বস্তুত পরমাণুসমূহের মিলনই ইলেকট্রনের 'ঘর-বাঁধা'র মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

খাদ্য লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইডে সোডিয়াম পরমাণু বাইরের স্তরের একটি ইলেকট্রন দান করে ধনাত্মক সোডিয়াম আয়নে এবং ক্লোরিন পরমাণু ইলেকট্রনটি গ্রহণ করে ঋণাত্মক ক্লোরাইড আয়ন রূপে বিরাজ করে আর বিপরীতধর্মী আধানের নিবিড় তড়িদাকর্ষণের ফলে এদের

মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সোডিয়াম আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন উভয়েরই গলায় শোভা পায় আট-ইলেকট্রন মালা। অনুরূপ মিলন পর্যায় সারণির (দীর্ঘ পর্যায়) প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত সদস্যদের সঙ্গে ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণিভুক্ত সদস্যদের ঘটে থাকে। রসায়নের ভাষায় এরকম মিলনকে বলা হয় তড়িৎ যোজ্যতা।

কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে এক বা একাধিক মৌলের পরমাণু সমূহ সমসংখ্যক ইলেকট্রন দিয়ে ইলেকট্রন জোড় গঠনের মাধ্যমে সম্বন্ধ স্থাপন করে। যেমন মিথেনের চারটি কার্বন-হাইড্রোজেন বন্ধনের প্রতিটি বন্ধন হাইড্রোজেনের একটি ইলেকট্রন এবং কার্বনের একটি ইলেকট্রন নিয়ে গঠিত। ইলেকট্রন যুগলকে কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক আকর্ষণ করে নিয়ত নিজের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট থাকে। অর্থাৎ এখানেও তড়িতাকর্ষণ বল, যদিও তড়িৎ যোজ্যতার তুলনায় মৃদু, ক্রিয়াশীল। এরকম মিলনকে বলা হয় সমযোজ্যতা। দেখা গেছে পর্যায় সারণির চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির সদস্যরা সমযোজ্যতার বাঁধনে আবদ্ধ হতে পছন্দ করে। অবশ্য অন্যান্য শ্রেণির অধাতব সদস্যরাও সমযোজ্যতায় অংশগ্রহণে আগ্রহ দেখায়।

অ্যামোনিয়া যৌগে একটি নাইট্রোজেন পরমাণু তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে তিনটি সমযোজী বন্ধনে যুক্ত থাকে তদুপরি নাইট্রোজেনের গলায় থাকে 'অরক্ষণীয়া' নিঃসঙ্গ দুটি ইলেকট্রনের একটি জোড়। অ্যামোনিয়া গোত্রীয় যৌগ সময় সময় চেষ্টা তদ্‌বির করে 'ঘর জামাই' বেছে একযোগে 'অরক্ষণীয়া' ইলেকট্রন জোড়কে দান করে। যেমন অ্যামোনিয়া তার নাইট্রোজেনের গলায় থাকা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় দান করে বোরন ট্রাইফ্লোরাইডের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে। এরকম রাসায়নিক মিলনকে বলা হয় অসম যোজ্যতা। প্রকৃতির দিক থেকে এটি তড়িৎ যোজ্যতা ও সমযোজ্যতার মাঝামাঝি।

পরমাণুর আট-ইলেকট্রন মালা ধারণে ব্যতিক্রম যে ঘটে না এমন নয় যেমন-সালফার হেক্সাফ্লোরাইড (SF_6), এখানে সালফারের গলায় শোভা পাচ্ছে বারো-ইলেকট্রন মালা। তাছাড়া আজকাল আট-ইলেকট্রন মালাধারী 'রাসায়নিক ব্রহ্মচারী' বলে কথিত নিষ্ক্রিয় গ্যাস পরিবারের সদস্যদেরও চিত্ত বৈকল্য ও গোপন অভিসারের সংবাদ প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন— জেনন, ফ্লোরিনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তৈরি করে জেনন টেট্রাফ্লোরাইড (XeF_4)।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি আমাদের মধ্যে কার্বন পরিবারের একটা বিশেষ মাহাত্ম্য লক্ষ্য করা যায়। কার্বন পরিবারের প্রথম সদস্য কার্বন জীবজগতের ভিত্তি গড়ার কারিগর হিসেবে গণ্য হয় আর ঐ পরিবারের অন্যতম সদস্য সিলিকন স্থলমণ্ডলের ভিত্তি প্রস্তর গড়ার দাবিদার। আকৃতি, প্রকৃতি ও অবস্থানের কল্যাণে কার্বন হয়ে উঠেছে অদ্বিতীয়। কার্বনের যৌগসংখ্যা

প্রায় এক কোটি আর প্রতিবছর কার্বনের যৌগভাণ্ডারে যুক্ত হচ্ছে আরো পঞ্চাশ হাজারের মতো নূতন যৌগ। বিভিন্ন যৌগে কার্বনের সঙ্গে থাকে মূলত হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, থাকে নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস প্রভৃতি। কিছু কিছু কার্বন যৌগের সঙ্গে ধাতব মৌলের সখ্যও লক্ষ্য করা যায়। অজৈব যৌগের সংখ্যা অনেক কম, বলতে গেলে কার্বন যৌগ সংখ্যার প্রায় এক শতাংশ।

তরুণ বন্ধুরা, আমাদের কিছু কিছু কথাবার্তা হয়তো তোমাদের বেশ খটোমটো লেগেছে। তোমাদের বড়োরা, দাদা-দিদিরা হয়তো আমাদের কথায় মজা পেয়ে থাকবেন আর নূতন মৌল গড়ার স্বপ্ন দেখবেন। তোমরাও নূতন মৌল গড়ার স্বপ্ন দেখবে কী !

বলা যেতে পারে বর্তমান পর্যায় সারণি সম্পূর্ণ। পর্যায় সারণির সর্বশেষ 118 নম্বর ঘরটি পর্যন্ত বরাদ্দ হয়ে গেছে। তাই বলে আমাদের বংশ বিস্তার আর কোনোদিন কিছুমাত্র ঘটবে না এমনটি বলা কি সংগত হবে! তোমাদের তাত্ত্বিক বিজ্ঞানিগণতো মৌলের 'স্থায়ী দ্বীপ' ভাবনাকে আরো প্রসারিত করতে ইচ্ছুক। তাঁরা মনে করেন পারমাণবিক সংখ্যা, $Z=126, 164$ এমনকী 184-এর নিকটে 'স্থায়ী দ্বীপ' থাকতে পারে। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানিগণ 126 নম্বর মৌল সংশ্লেষণেরও একটি রূপরেখা তুলে ধরেছেন ঃ

$$^{230}_{90}\mathrm{Th} + {}^{80}_{36}\mathrm{Kr} \longrightarrow {}^{310}_{126}$$

$$^{231}_{91}\mathrm{Pa} + {}^{79}_{35}\mathrm{Br} \longrightarrow {}^{310}_{126}$$

ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী প্রকৃতি জাত খনিজে 116, 124 এবং 126 পরমাণু সংখ্যার মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে দাবি করেছেন। তাই আগামী দিনে আমাদের বংশ বিস্তারের বার্তা নিশ্চিতভাবে প্রকাশ পেলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। এমনও তো হতে পারে তোমাদেরই কেউ ঐ বার্তা নিয়ে আসবে! আর তখন সংগত কারণেই পর্যায় সারণির নবকলেবর ধারণ হয়ে উঠবে অনিবার্য।

'মৌলকথা' শেষ করতে গিয়ে তোমাদের কবির কথা ধরে বলতে হয় ঃ

"শেষের মধ্যে অশেষ আছে
এই কথাটি মনে
আজকে মোদের বলার শেষে
জাগছে ক্ষণে ক্ষণে"

পরিশেষে এইটুকু বলতে পারি — আমাদের কথা রইলো অ-স-মা-প্ত।

বিষয় সূচি

'মৌল কথা'র তথ্যসূত্র ঃ

1. রাসায়নিক মৌল, দ. ন. ত্রিফোনভ; ভ.দ. ত্রিফোনব, মির প্রকাশন, মস্কো।
2. Understanding Chemistry, C. N. R. Rao, Universities Press.
3. Text Book of General Chemistry, B. Nekrasov, Peace Publishers.
4. Adv. In organic Chemistry, F. A. Cotton, G. Wilkinson, Wiley Eastern.
5. Fundamental Concepts of Inorganic Chemistry, E. S. Gilreath, Mc Graw-Hill.
6. Concise Inorganic Chemistry, J. D. Lee, ELBS.
7. General and Inorganic Chemistry, P. K. Dutta, Sarat Book House.
8. অজৈব রসায়ন, আর. এল. দত্ত, দি নিউ বুক স্টল।
9. Chemical Periodicity, R. T. Sanderson, East West Press.
10. Inorganic Chemistry, T. Moeller, Asia Publishing House.
11. Fundamentals of Chemistry, D. H. Andrews, R.J. Kokes, Wiley Eastern.
12. কিশোর রচনা সমগ্র, জগদীশচন্দ্র বসু, শৈব্যা প্রকাশন ৰিভাগ।
13. বিজ্ঞানের আঙ্গিনায়, অশোক কুমার ভট্টাচার্য, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী।